বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
জ্ঞান পথের সহায় ও অন্তরায়	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি,এল,	...	...	২
টুর্গেনিভের গদ্য কাব্য	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১,২৫
তুমি ও আমি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত	...	...	১৯৯
ত্যাক্তেন ভূক্তীথা	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	...	...	২২৬
দান ও দয়া	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম,এ,	...	...	২১৭
দিদিমা (গল্প)	সম্পাদক ..	...	...	১১৩
নববর্ষ	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	...	...	১৪৫
নাস্তিক (গল্প)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর বি, এ,	...		২৯
নামের নানা নক্সা	শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ বি.এ,	...		১৫৪
নিয়তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	...		৯৬
নেপালী দরবার	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ	...		১৯৩
পাতা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বি, এল,	...		১৫৮
পতিব্রতা	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	...		২৩২
পিতৃভক্তি (জর্ম্মাণ গল্প)	সম্পাদক ...	...		২২৯
প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	২৫৩
প্রভাত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সত্যব্রত চৌধুরী	...	...	১৪৯
প্রাচীন কবিগান	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	...	...	৯৩
বাঙ্গালার পাখী (বুলবুল)	রাজা শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ সিংহ	...	...	১১১
বাল বিধবা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১৫২
বিপর্য্যয় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	...	...	১৮৪
বিমান মার্গে ট্রাম	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	...	...	১৪৩
বেদিয়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	...	...	৭
বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম,এ,	...	...	২৬
ভগ্নমন্দির (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	...	...	৫২
ভারতে ইংরেজ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী	...	...	২৩৭
ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ--ব্রহ্মগুপ্ত	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এস্, সি	...	...	১১৮
ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ--ভাস্করাচার্য্য	ঐ	...	...	১৪১
মঙ্গল গ্রহের খবরাখবর	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	...	...	১৯৮
মনুষ্য শরীরের উপাদানের মূল্য	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	...	...	২৩
ময়মনসিংহের কবি কাহিনী—কবি হায়াইল বিশ্বাস	শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য	...	...	১৩১
ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত	ঐ ..		...	৫৮
মহারাজচন্দ্রগুপ্ত	শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত বি,এ, বি,এস সি,	...		২৩৮
মধুমক্ষীর দৌত্য	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ...	...		১৪৪
মা আনন্দময়ী (চিত্র)	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত	...	...	২০২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মিলনের ব্যথা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার এম,এ, ...	১৪৪
মেসমেরিজম (ইংরেজী গল্প)	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ...	২৭৪
মোক্ষলাভ (কবিতা)	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি,এ, ...	১৬৮
মোটর বাঁশী	শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়	১৪৪
রজক ও রাসভ (কবিতা)	শ্রী—	২৫৬
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত সত্যব্রত চৌধুরী	১৮৬
রাজা রামমোহন রায়	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর বি,এল, ...	৪১
শক্তিপূজা	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	১৩৩
শব্দানুভূতি	ঐ	১৯৭
শোক সংবাদ	... ...	১২০
শ্মশান বন্ধু (গল্প)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকিশোর সরকার	৮৩
শ্রান্তা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ	২৩৭
সঙ্গীতের ব্যয়	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	২৩
সত্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অনুপমচন্দ্র রায় বি,এ, ...	১১৯
সমস্যা (সামাজিক উপন্যাস)	৮,৪৪,৫২,৭৭,১০৬,১২৫,১৬০,১৭২,২১২,২৪৪,২৬৩	
সাধু দর্শন	শ্রীযুক্ত মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি,এল, ...	১৫২
সুনিদ্রা ও অনিদ্রা	শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুপ্ত	২৪
স্বর্গীয় পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন	শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ	২৪২
স্মৃতির বিচার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী বি,এ, ...	১৩
হৃদয় রাণী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২৭৪
ক্ষুদ্র ভুল (গল্প)	সম্পাদক	২৫৪

সৌরভ

অষ্টম বর্ষ। | ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৬। | প্রথম সংখ্যা।

টুর্গনিভের গদ্য কাব্য।

প্রার্থনা।

মানুষ যাহা কিছু পাইবার জন্য প্রার্থনা করে তাহার মূলে কিছু একটা অলৌকিক কাণ্ড রহিয়াছে। প্রত্যেক প্রার্থনার সার কথা এই—হে মহান্ জগদীশ্বর, যেন দুই আর দুইয়ে চার না হয়, তাহাই কর!

প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত প্রার্থনাই এইরূপ। পার্থিব শক্তির নিকট, মহাপ্রাণের নিকট, নানা দার্শনিকের নানা মতের নানা দেবতার নিকট এবং নিরাকার ভগবানের নিকট যে সমস্ত প্রার্থনা করা হয়, সেই সমস্ত অসঙ্গত ও অভাবনীয়।

কিন্তু ব্যক্তিগত, জীবন্ত মূর্ত্ত ভগবান্ কি দুই আর দুইয়ে চার না করিয়া পারেন?

প্রত্যেক বিশ্বাসী উত্তর দিতে বাধ্য, তিনি তাহা পারেন এবং তাহা করাইতে তাঁহাকে যুক্তি পরামর্শাদির দ্বারা প্ররোচিত করিতে বাধ্য করেন।

কিন্তু যদি যুক্তি তাহাকে এই নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলে?

তখন মহা কবি সেক্সপিয়র বিশ্বাসীকে সাহায্য করিতে আসেন। "হরেশিয়ো, স্বর্গে ও মর্ত্তে আরও এমন কিছু আছে—" ইত্যাদি

যদি বিশ্বাসীরা সত্যের দোহাই দিয়া তাঁহার এই মতলব খণ্ডন করিতে আরম্ভ করে, তবে তিনি এই বিখ্যাত প্রশ্নটি উত্থাপন করিতে পারেন—সত্য কি?

সুতরাং তবে আর কি—এস আমরা খাই দাই, মজা করি, আর যাহা বুলি আওড়াইয়া প্রার্থনা করি।

মাথার খুলি।

বহু মূল্য দ্রব্য পূর্ণ একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ। অনেক ভদ্র মহিলায় ও পুরুষে ঘরটী ভরা।

সকলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল—বেশ গল্পগুজব চলিতেছে। জনৈক বিখ্যাত গায়িকার সম্বন্ধে মজার কথাবার্ত্তা হইতেছে। তাহারা তাহাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করে। ওঃ, কাল সে কেমন সুমধুর শেষ গানটি গাহিয়াছিল! এখনো কাণে সেই গানের রেশ লাগিয়া রহিয়াছে!

হঠাৎ যাদুকরের যাদুর মত প্রত্যেকের মাথার ও মুখের চামড়ার আবরণ সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মরা মানুষের মাথার শাদা খুলির মত সব শাদা শাদা খুলি সম্মুখে! মাংস বিহীন মুখের হাড় ও মাড়িগুলা এখানে সেখানে দেখিয়া চক্ষু স্থির!

ভীষণ ভয়ে আমি ঐ সব চোয়ালের ও মাড়ির নড়া চড়া দেখিতে লাগিলাম। মোমবাতির আলোকে ঐ সমস্ত পিণ্ডময় হাড়ের বলগুলা ঝক্‌মক্ করিতেছিল। আবার গোল গোল গর্ত্তগুলার ভিতর অর্থশূন্য চক্ষুগুলি ঘুরিতে ফিরিতেছিল।

আমি নিজেই আমার মুখ স্পর্শ করিতে সাহস করি নাই; নিজকে আয়নাতে দেখিতেও বুকে বল পাইলাম না।

মাথার খুলিগুলা পুরের মত ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। কণ্ঠস্বরও ঠিক আগেকার মতনই। টুকরা টুকরা ছেঁড়া শাদা বস্ত্রখণ্ডের মত তাহাদের জিহ্বাগুলি কেমন অদ্ভুত ভাবে আধ আধ কথা বলিতেছিল! হাঁ, কেমন সুন্দর ভাবে অমরী গায়িকা সুমধুর শেষ গানটি গাহিয়াছিল।

বুড়া মানুষ।

জীবন মহা তিমিরে ঘিরিল। দেহ শক্তিহীন, আশা-হীন জীবনে প্রিয়জনের দুঃখ, বার্দ্ধক্যের তমসা সমাগত! তুমি যাহা কিছু ভালবাসিতে, যাহা কিছু প্রিয় মনে করিতে, যাহা কিছু আশ্রয় করিয়াছিলে—সে সব শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে! এখন পতনের পথে, ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইতেছে।

তুমি কি করিতে পার? দুঃখ প্রকাশ? ক্রন্দন? কিন্তু তাহাতে কোনো ফল নাই—না নিজের, না পরের।

নুইয়ে পড়া শুকনো গাছের পাতা গুলি আকারে ছোট, সংখ্যাতেও কম; কিন্তু ভিতরটা আগেকার মতই সরস ও সবুজ!

তুমি অন্তর্মুখী হও; নিজের ভিতরে, নিজের স্মৃতির ভিতরে ডুবিয়া যাও! আত্মার অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ কর; অতীতের স্মৃতি উদ্ঘাটন তোমারই হাতে! দিন আসিবে। শুভ বসন্ত সুকুমার সরস সৌন্দর্য্য আবার আনয়ন করিবে।

হা হতভাগ্য বুড়ো, সাবধান—আর সম্মুখে তাকাইও না।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞানপথের সহায় ও অন্তরায়।

গত জুন সংখ্যক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে The Intellectual Life (সাহিত্যিক জীবন) নামক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞ লেখক "গ্রন্থবিলাসী" (Bibliophile) এই কাল্পনিক আখ্যার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এ সতর্কতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হইলেও তাঁর এই কল্পিত নামটি যে সুপ্রযুক্ত ও সার্থক হইয়াছে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রবন্ধের ভিতরেই রহিয়াছে। জ্ঞানপিপাসু লেখক জ্ঞানার্থীর উন্নত জীবনাদর্শটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া এবং ঐ আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে সকল বাধা বিঘ্ন আসিয়া জোটে তদ্বিষয়ে নিজের এবং বিখ্যাত মনীষিগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার এই চেষ্টা আমাদের শিক্ষিত-সমাজে কিয়ৎপরিমাণেও সাহিত্যিক চেতনা এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিতে সহায়তা করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। যাই হউক, লেখকের প্রশংসা কিম্বা তাঁহার সমগ্র লেখাটীর সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে,—সাহিত্য-চর্চ্চার যে সকল সামাজিক অন্তরায়ের উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

"Proper study of mankind is man" 'মানুষ কি, মনুষ্যত্ব কিসে—এই তত্ত্বের অনুসন্ধানই মানব জাতির জ্ঞানচর্চ্চার প্রকৃত বিষয়'—এই প্রাচীন উক্তির সারবত্তা কে অস্বীকার করিবে? ফলতঃ দেখিতে পাই, মানুষের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের মুহূর্ত্ত হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার সকল উচ্চতর কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও সাধনার মূলে ঐ মনুষ্যত্বের সন্ধানরূপ একমাত্র উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তবে, প্রাচীনদের ও আধুনিক কালের জ্ঞানানুশীলনে যাহা কিছু প্রভেদ তাহা প্রণালীর বিভিন্নতায়, উদ্দেশ্যের পার্থক্যে নহে। প্রাচীন জ্ঞানীরা বাহিরকে, বিশ্ব-জগতকে ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া তাঁহাদের জ্ঞেয় পদার্থকে খুঁজিতেন—তাঁহাদের প্রণালী ছিল অন্তর্ম্মুখীন (introspective)। কিন্তু আধুনিক মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অতীন্দ্রিয় প্রণালীই প্রচুর নহে, ইন্দ্রিয়েরও সহায়তা আবশ্যক। মানুষের বাহিরে মহান্ বিশ্ব-কবি-রচিত বিরাট্ দৃশ্যকাব্য বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহার এক অঙ্ক অতীতের তিমির ঘন সুদূর দিগন্তের সীমানা পর্য্যন্ত প্রসারিত, এক অঙ্ক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সঙ্গীতময়ী বাহ্য প্রকৃতির সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্র-পটে অঙ্কিত, এবং আরেক অঙ্ক সুখ-দুঃখ-কর্ম্মান্দোলিত বর্ত্তমান মানব সমাজের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সজীব অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইতেছে। মানুষকে জানিতে হইলে সে আদিম শৈশবাবস্থায় কিরূপ ছিল এবং সে অবস্থা হইতে অবস্থা ও অভিজ্ঞতা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া কিরূপে বর্ত্তমানের সুসভ্য মানুষে উদ্‌বর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিজের চেষ্টায়, ইতিহাসের আলোকে, অতীতের

খবর পাইয়া আজকার Routin বদলাইয়া লইয়াছি; সাক্ষাতে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। দয়াল—দয়াল--তারপর, কলিকাতা আর আছেন কত দিন?"

"আজই চলিয়া যাইব।"

"বাড়ীতে কি ভাল থাকেন?

"মন্দ থাকি না।"

"গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে এই সুখ—শেষ বয়সটা পেন্সন, আর হরি নাম—দয়াল ব্রহ্ম—"

ওই শেষটারই অবসর কম; দলাদলির এত মার পেচ্ যে অনিচ্ছা সত্বেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয়।"

দুর্গা—"আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের লোক পশ্চিম বঙ্গের লোক হইতে কিন্তু খুব sincere যাই হউক!"

জগবন্ধু বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আর কোন বিষয়ে না হইলেও শত্রুতা সাধনে খুবই—"

দুর্গা দাস বাবু হাসিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল দলাদলির বিষয় কি?"

"একেবারে কিছুই না। অথচ পথ্য হজম করিবার একমাত্র গ্রাম্য মহৌষধই ঐ দলাদলির হুজুগে বৃথা লম্ফঝম্ফ দৌড় ধাপ—বাক্যব্যয়; যা ইচ্ছা তাই—"

দুর্গাদাস বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন—"যাই হউক ছেলেটী উপযুক্ত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এবার কোন year তোমার বাবা?"

শৈলেন ও নগেন এতক্ষণ ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া যেন বেশ শান্তি পাইতেছিল। পরিস্কার হলটী সুন্দর সাজান—যে স্থানে যেটী রাখিলে মানাইবে, ঠিক সেই জিনিসটী সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ঘরের দেয়ালে মহাত্মাদিগের চিত্র আয়নার ফ্রেমে ঝুলান—এক দিকে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ত্রৈলঙ্গ-স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, একদিকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, অন্যদিকে মেরির ক্রোড়ে যিশুখৃষ্ট, তার দুইদিকে দুইটী প্রার্থনাপরায়ণা বালিকা—চিত্রগুলির দিকে তাকাইলে গৃহস্বামীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়ে। চিত্রগুলির মাঝে মাঝে সুন্দর বড় বড় অক্ষরে "একমেবদ্বিতীয়ম" "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্," "সত্যমেব জয়তে," "ধর্ম্মই সুখ" ইত্যাদি 'মোটো' গুলি বিনস্ত হইয়াছে।

শৈলেন ও নগেন মুগ্ধনেত্রে সেগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। দুর্গাদাস বাবুর প্রশ্নে সে মস্তক নত করিয়া বলিল--"এটা 5th year"

"বেশ বাবা, ভগবান করুন, পাশ হইয়া আইস।"

দুর্গাদাস বাবু "বসুন" বলিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। কিছু কাল পরেই তাঁহার মেয়ে ছেলেরা পর্দ্দা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল; পাছে পাছে দুর্গাদাস বাবুও আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুর্গাদাস বাবু ছেলে মেয়েদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওদেরে প্রণাম কর, তারপর বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাও।"

পারুল, বকুল, আশা ও তাতা পিতার আদেশ অনুসারে একে একে তিন জনকেই প্রণাম করিল।

পর্দ্দার আড়ালে গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জগবন্ধু বাবু উঠিয়া ভিতরে গেলেন। আশা শৈলেনের কবলে ও তাতা নগেনের কবলে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং প্রতি-প্রশ্ন করিয়া শৈলেন এবং নগেনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

নগেন হাসি মুখে—সকলেই শুনে অথচ চুপি চুপি—তাতাকে বলিল "তোমার দিদিদের পরিচয় দাও দেখি; পরিচয় না হইলে আলাপ করিব কি করিয়া?" নগেনের কথা শুনিয়া বড়মেয়ে পারুল হাসি মুখে কাপড় গুজিয়া সরিয়া পড়িল, তারপর বকুলও তাহার দিদির অনুসরণ করিল।

নগেন তাতাকে বলিল "তোমার দিদিদের নাম কি? তাতা বলিল—ছোট দিদির নাম বকুল, বড় দিদির নাম পারুল।" তাতা থামিল না—বলিতে লাগিল "বড় দিদি ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনে পড়ে। আমি স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই। আমি, ছোট দিদি, আর দাদা বাড়ীতে পড়ি। আশা দাদা সুন্দর ছবি আঁকিতে পারে।"—বলিয়া তাতা দৌড়িয়া গিয়া পার্শ্বের কোঠার দরজার পর্দ্দা সরাইয়া নগেন ও শৈলেনকে

রাস্তায় আসিয়া নগেন আস্তে আস্তে শৈলেনকে বলিল—"জাতিটা একেবারে মাঠে মারা গেল।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল—'দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থাও আছে—কলিকাতার অনেক লোক রাত ভরিয়া কুকর্ম্ম করে, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সে পাপ ধুইয়া দেয়—চল গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগবন্ধু বাবু একটা দেওয়ানী মোকদ্দমার আপিল করিতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করিয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ও ছেলেকে তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

পীরপুর ঢাকা জেলার একটী গণ্ড গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নমশূদ্র, মালী মুসলমান সকল জাতিই দুই চার-দশ ঘর করিয়া আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যে গ্রামে যত বেশী, সামাজিক দলাদলিও সে গ্রামে তত বেশী হইয়া উঠে। পীরপুরের এই সামাজিক দলাদলির অবধি ছিল না।

জগবন্ধু বাবু এই গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ঠ তালুকদার। তিনি ত্রিশ বৎসর কাল কালেক্টরীর সেরেস্তাদারী করিয়া এখন পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। জীবন ভরিয়া বিদেশে থাকিয়া তাহার সমাজ ও সংসার জ্ঞান একেবারেই ছিল না। পূজার ছুটীতে বৎসরে একবার করিয়া যখন বাড়ী আসিতেন, তখন বার দিনের পল্লিচিত্র তাঁহার মনে পুণ্য ভাব জাগাইয়া দিত। গ্রামের ভদ্র ইতর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার যে গুণ কীর্ত্তন করিত, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইতেন। বহু গ্রাম্য বিবাদ ও দলাদলি নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া এবং উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থীকে সদুপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান করিয়া তিনি আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন। এই সকল কারণে পেন্সন লইয়া আসিয়া এইরূপ সৎ-সহবাস ভোগ করিয়া যে তিনি জীবনের শেষ দিন গুলি সুখে ও শান্তিতে কাটাইতে পারিবেন, ইহাই তাহার আশা ছিল। এখন দেখিলেন, তাঁহার সে কল্পনা, তাঁসের ঘরে গৃহস্থালী অবস্থা দেখিয়া প্রথম কয়েক বৎসর তিনি বাড়ী ছাড়িয়া পুনরায় সহরে আসিয়াই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন নিজকে নিরাপদ রাখিতে পারিলেন না; মামলায় মোকদ্দমায়, সমাজে-সালিসে নিজকে সম্পূর্ণ জড়িত দেখিতে পাইলেন, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া ঘরে আসিয়াই বসিলেন।

এখন জগবন্ধু বাবুও একজন সমাজপতি। তিনি আর এখন সামাজিক গোলমালে বা মামলা মোকদ্দমায় নিজকে বিপন্ন মনে করেন না; বরং একটু অগ্রসর হইয়াই তাহা মাথা পাতিয়া লন।

জগবন্ধুর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শৈলেশ কালেক্টরীর কেরাণী, দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন বি, এস্ সি. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। এবার তাহার শেষ পরীক্ষার বৎসর।

জগবন্ধু বাবু যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম ডাক্তার দুর্গাদাস চৌধুরীও সেই গ্রামের জামাতা। প্রথম বয়সে উভয়ই কেশব সেনের বক্তৃতা ও প্রার্থনা শুনিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এই সূত্রে তাঁহাদের পরিচয়। যৌবনের ভাব উত্তেজনা কাটিয়া গেলে জগবন্ধুর ব্রহ্মজ্ঞান টুটিয়া যায়, তিনি জীব বিশেষের ন্যায় সরল ভাবে সংসার কোটর অবলম্বন করেন। এখন তিনি এক জন পূজা আহ্নিক পরায়ণ আনুষ্ঠানিক হিন্দু; দুর্গাদাস বাবু ব্রাহ্ম সমাজের নিষ্ঠা পরায়ণ ব্রাহ্ম।

জগবন্ধু বাবু দুই সপ্তাহ বাড়ী ছাড়া ছিলেন। আসিয়া শুনিলেন—সমাজে কয়েকটী নূতন মীমাংসার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার একটী লইয়া গ্রামে হুলুস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছে।

সমস্যাটী এই— কালী গ্রামের গুরুপ্রসাদ বাবুর আদ্য শ্রাদ্ধ, তাঁহার ব্যারিষ্টার পুত্র খুব সমারোহ সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে পীরপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ বিরোধী ছিলেন; তাঁহারা বিলাত ফেরতাকে সমাজে লইতে নারাজ। এখন যাহারা এই শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ চ্যুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পীরপুরের জীবন তর্করত্ন এই শ্রাদ্ধে

আশা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"সে তো শৈলেন দাদাই দিলেন। আপনি তো আর আমাদের বাড়ী গেলেন না?"

"তুমিও তো আমাকে নিয়ে যাইতে আসিলে না!"

আশা ভাবিল, শৈলেনের নিকট তাহাকে দেখিয়াই বুঝি নগেন বাবু তাহাকে একথা বলিলেন।—সে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"আপনার ঠিকানা তো আমাকে বলেন নাই, শৈলেন দাদা আর্ট জার্নাল নিতে বলিয়া আসিয়াছিলেন—চলুন না আপনার বাসাটা দেখিয়া আসি।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"তা বেশ, শৈলেন আসুক, তারপর চল যাই, তোমাদের বাড়ীর ওঁরা সব আছেন কেমন? আমাদের কথা—"

নগেনের মুখে কথা আটকাইয়া গেল।

আশা বলিল—"সকলেই ভাল আছেন। আপনারা তো আর গেলেন না; চলুন না আজ যাই। বাবা, মা প্রায়ই তো আপনাদের কথা বলেন।"

নগেন আর কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিল, পারিল না। কেবল বলিল—"তবে, আমাদের বাড়ী যাবে, না তোমাদের বাড়ী যাব?"

"চলুন—আজ আমাদের বাড়ীতেই যাই; আমি অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি—আধ ঘণ্টার জন্য আসিয়াছিলাম—"

"এই সময় মুখ ধুইয়া শৈলেন ঘরে প্রবেশ করিল। আশা বলিল—"শৈলেন দা আমাদের বাড়ী চলুন!"

"কেন হে?"

"যাইতে নাই কি?"

নগেন আশার পক্ষ হইয়া বলিল—"বেচারা আধ ঘণ্টার ছুটী লইয়া আসিয়াছিল—তুমি দুই ঘণ্টা করিলে।"

"আচ্ছা তবে চল—এই তোমার আর্টজার্নাল দু খানা লও।" বলিয়া শৈলেন চিরুণী লইয়া কেশ বিন্যাসে রত হইল।

নগেন ও শৈলেন রবিবার বিকালে একবার দুর্গাদাস বাবুর বাড়ী যাইবে স্থির করিয়াছিল। আশার অনুরোধ উপরন্তু মাত্র।

স্মৃতির বিচার।

(Shelleyর to the music হইতে)

গীতের লহর চাহে চিরকাল গীতের সাথেই হইতে শেষ,
স্মরণে কিন্তু প্রতি পলে পলে বাজি উঠে তার সুরের রেশ।
মল্লিকা তা'র মরণ সাঁঝে মৃত্যু আঁধারে অঙ্গ ঢাকে,
অমিয় মধুর গন্ধ টুকু মন্দ অনিল জড়ায়ে রাখে।
গোলাপ যখন শুকায় শোকে পাপ্‌ড়ী হেথা ধুলায় ঝরে,
প্রেমিকা তাহে কুঁড়িয়ে রাখে শয্যাপাশে যত্ন করে।
প্রিয়ার মরণ মর্ত্তে কভু হয়না প্রেমিক পরাণ মাঝে,
সুখের স্মৃতি ভুলিয়ে তারে মত্ত রাখে সকাল সাঁঝে

প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

ইতিহাসের কয়েকটী কথা।

বর্ত্তমান সময় ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নানাবিধ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অতীত ভারতের গৌরবময় যুগের বিস্মৃত কাহিনী—রীতি-নীতি ও সভ্যতার আদর্শ পুনরুদ্ধার করিয়া আধুনিক উন্নত-মার্গে প্রতিষ্ঠিত জাতি সমবায়ের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সভ্য জগতের সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে যে আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি নবীন আমেরিকা এবং প্রাচীন ইউরোপ যখন মহারণ্য বক্ষে লইয়া কেবল অরণ্যের পশু পক্ষী ও বর্ব্বর জাতির আবাস স্থলে পরিণত ছিল, তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে এই আর্য্যভূমিতে সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মধ্যযুগে ভারতের কীর্ত্তিগৌরব আধুনিক সভ্য সমাজের নিকট যাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, সেই সকল নৃপতি কিংবা মহাপুরুষগণের ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে না, অথচ সেই সকল মহাপুরুষের কাহিনী জানিবার আবশ্যকতা প্রতিদিন অনুভূত হইতেছে।

সাধ হইল কন্যাকে দুই গাছি বালা প্রস্তুত করিয়া দেয়, কিন্তু খোরসেদ তার সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিল না। ঋণে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। মহাজন যখন তখন তাহাকে বলিয়া থাকে—খোরসেদ দেনা শোধের কি করিয়াছ, সুদে আসলে যে অনেক টাকা হইয়া গেছে, তোমার বাড়ী ঘরেরও ত জীর্ণ দশা আমি আর এত টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারিব না। যদি সত্বর টাকা শোধ না দেও, তবে আমাকে বাধ্য হইয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হইবে।"

খোরসেদ সবিনয়ে বলিত "আর দু চার মাস অপেক্ষা কর, আসে চৈতে তোমার সব টাকা শোধ ক'রব।" কিন্তু শোধ যে কোথা হইতে হইবে, তাহা খোরসেদ বুঝিত না, দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত। সেইরূপে তাহার মনের প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদ্যম—সব চলিয়া গেল।

যুদ্ধ থামে নাই সুতরাং দেশের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত একটা অভাবের সাড়া পড়িয়াছিল। এই দুর্ভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। পর মুখাপেক্ষীর যাহা হয়, বাঙ্গালার সে সময় সেই দুর্গতি ঘটিল। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, তৈল নাই, ঘরে দীপ জ্বালাইবার উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। যে শ্রমজীবি দৈনিক আট পয়সা উপার্জ্জন করে, তাহাকে সুজন্মার বৎসরও চারি টাকা মনে চাউল কিনিয়া সংসার চালাইতে হয়। খোর সেদ দেখিল এক মন মোটা চাউল কিনিতে ৯৲ টাকার কমে হয় না। প্রত্যেক রোজ এক বেলা খাইলেও তাহার মাসে এক মন চাউলের কম চলিতে পারে না। কিন্তু কোন মাসে সে পাঁচ ছয় টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। ক্রমে এমন হইল যে তাহার দুই বেলা আহার চলে না।

মহাজনের পীড়াপীড়িতে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে তাহার চাষ আবাদের সম্বল গরু ২টী ও বিক্রয় করিবে স্থির করিল কিন্তু তাহাতেও মহাজনের সুদের টাকার অর্দ্ধেক ও শোধ হইবে না। কিন্তু যে দুটী গরু ছিল, তার একটী গাভী, ও একটী বলদ। গাভীটী কিছু দুধ উপায় ছিল, কিন্তু কি করিবে সে? উপায় নাই। মহাজনকে বাধা রাখিতে হইবেতো? নতুবা যে সে ভিটা ছাড়া করিবে।

সে দিন রাত্রে খোরসেদ দুইটা কাঁঠালের কোষ মুখে দিয়া এক ঘটি জলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া শুইয়া তামাকু টানিতে লাগিল। মালেকা নিকটেই এক খানা মাদুর বিছাইয়া তাহার দুই দিকে দুইটী সন্তান লইয়া পড়িয়া আছে। তাহার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, রুক্ষ কেশ, মলিন বস্ত্র, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ, চিন্তায় মন অবসন্ন। কেবল স্বামী ও পুত্রের মুখ চাহিয়া সে সকল যাতনা সহ্য করিত, কোন দিন রাত্রে সে মুষ্টি চাউল চিবাইয়া ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত, কোন দিন হয়ত ঘরে চাউল থাকিত না দুটা একটা কাঁঠালের বীচি ভাজিয়া খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিত। বাড়ীতে কয়টী কাঁঠাল গাছ ও কলা গাছ ছিল তাই রক্ষা।

(৩)

মা! মা! কোন শব্দ নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু আবার ডাকিল 'মা'। তেমন নিস্তব্ধ। নিকটে মালেকা মাদুরে শুইয়াছিল। শিশু একবারে মায়ের পিঠের উপর আসিয়া পড়িল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের মাথাটি মায়ের গায়ের উপর রাখিয়া তাহার কোমল কর পল্লবে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বলিল? "মা তুমি কাঁদ। বাবা কি বকছে?"

মালেকা সত্য সত্যই কাঁদিতেছিল। এবার প্রবল বেগে চোখের জল তাহার দুই গাল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে মাকে ভুলাইবার জন্য বলিল "মা বড় ক্ষুধা দুধ খাব।" মায়ের দুঃখ সমুদ্র আরো উথলিয়া উঠিল মালেকা ছেলেটিকে জড়াইয়া বুকে লইয়া বলিল "বাচা তুমি কেন এই হতভাগিনীর পেটে জন্মিয়াছিলে। আমি এমন পাপিষ্ঠা যে তোমাদের ভাই বোনকে পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত খাইতে দিয়াও বাঁচাইতে পারি না। আল্লা, তোমার মনে এই ছিল?

ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনাহারে অবসন্ন প্রাণে মালেকা বিছানা লইল। শেষ রাত্রিতে একবার মালেকা জাগিল, কিন্তু দেখিল তখনও খোরসেদ আসে নাই। মালেকার প্রাণ ছটফট করিতেছিল একবার উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, অবসন্ন প্রাণে পড়িয়া রহিল।

* * *

অনেক বেলাতে ছেলে মেয়ের আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীরা আসিয়া যখন দরজা খুলিল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, মালেকাও পতির সন্ধানে সেই অচেনা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সঙ্কলন ও সংগ্রহ।

চিনির নূতন উপকরণ।

ইক্ষু, খেজুর, বিট, আলকাতরা, প্রভৃতি হইতে চিনি বহুকাল যাবত তৈয়ার হইতেছে; অধুনা কিন্তু এক অভিনব জিনিষ হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জোগার হইতেছে। ইংলণ্ডে ইহার বিশেষ আলোচনা চলিতেছে, বোধ হয় ইহার ঢেউ ভারতেও আসিয়া পঁহুছিবে। এবার চিনি তৈয়ারের চেষ্টা হইতেছে— করাতের গুড়া হইতে, পূর্ব্বে উহা বোতল শিশি পেক্ করিতে কিম্বা বরফ অবিকৃত ভাবে দীর্ঘ সময় রক্ষা করিতে ব্যবহৃত হইত। প্রথমতঃ করাতের গুড়া হইতে মদ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ছিল; কিন্তু আইনের ফেরে মদ তৈয়ার করা তত সহজ নহে মনে করিয়া উহা দ্বারা চিনি তৈয়ার করার চেষ্টা হইতেছে। করাতের গুড়া জল মিশ্রিত সালফিউরাস্ এসিডে জীর্ণ করতঃ ৬ কিম্বা ৭ বায়ব্য চাপের দ্বারা উহার শত করা ২৫ অংশ চিনিতে পরিণতঃ হয়, ইচ্ছা করিলে পচন ক্রিয়া দ্বারা এই চিনির ⅔ য় অংশ মদে পরিণত করা যায়।

সঙ্গীতে ব্যয়।

অর্থ ব্যয়ের দ্বারা দেশের অবস্থা বুঝিতে হইলে আমেরিকাকে সঙ্গীত প্রধান দেশ বলা যাইত। জন ক্রিমাণ্ড বলিয়াছেন যে, সমস্ত যুক্ত প্রদেশে বৎসর ১২০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড সঙ্গীতাদিতে ব্যয় হয়। আমেরিকাতে সামরিক ও নৌ সেনাতে মাত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ খরচ হইয়া থাকে। যে জার্ম্মান দেশ সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ, তথায় সঙ্গীতাদির ব্যয়ের দশ গুণ সামরিক ও নৌ সেনাতে খরচ হইয়া থাকে। আমেরিকাতে সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্রাদিতে ভজনালয়ে বৎসর ১০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। বৎসর ২৭, ০০০,০০০ পাউণ্ডের পিয়ান, ২০০০,০০০ পাউণ্ডের অর্গেন, ১৩, ০০০, ০০০ পাউণ্ডের গ্রেমফোনরেকর্ড ও ২, ১০০, ০০০ পাউণ্ডের সঙ্গীত পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার শত করা ৭০ হইতে ৭৫ পাউণ্ড মহিলা গণ ব্যয় করিয়া থাকেন।

মনুষ্য শরীরের উপাদানের মূল্য।

এক জন জার্ম্মান রাসায়নিক, এক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। মনুষ্য শরীরের উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে উহার কত দাম হয় তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। "মেডিকেল প্রেস ও সার্কুলার নামক কাগজে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১ মন ৩৫ সের ওজনের একটি মনুষ্য দেহের উপাদানের মূল্য ১পাউণ্ড ১১শিলিং ৩পেন্স। ঐরূপ একটি দেহে ১০শিলিং ৫পেন্সের মেদ (চরবি) পাওয়া যায়। উহাতে যে লৌহ থাকে, তাহার পরিমাণ অতি কম। উহাদ্বারা অতিকষ্টে ১ইঞ্চ পরিমাণ একটি পেরেগ তৈয়ার করা যায়, ইহাতে মুরগির একটি বড় রকমের ঘরের চুন কাম হইতে পারে এরূপ চুন পাওয়া যায়। সেই দেহের ফস্‌ফরাসের দ্বারা ২২০০ টি ম্যাচ বাতির কাঠী প্রস্তুত হইতে পারে। একটি মানব দেহে ১০০ শত ডিম্বের এলবুমেন (ডিম্বের শ্বেত পদার্থ) পাওয়া যায়। বোধ হয় ইহাতে চায়ের চামচের আন্দাজ সর্করা ও অল্প মাত্র লবন পাওয়া যায়"।

প্রথম দেখিতে মনে হয় যেন এক নূতন বাণিজ্যের পন্থা উন্মুক্ত হইল।

মৃত ব্যক্তিদিগকে চূর্ণে পরিণতঃ করিয়া জীবিতগণ দ্বারা কুক্কুট গৃহ চুন কাম করাইয়া লওয়া যত সহজ মনে হয় বস্তুতঃ ইহা তত সহজ নহে। উপাদান সকল, দ্বারা প্রকৃত মনুষ্য দেহ একবার গঠন করিলে উহা বিশ্লেষণ করিতে (আমাদের) উপাদানের মূল্যে ১পাঃ ১১শিঃ ৩পেঃ অধিক লাগে। আমাদের মৃত্যুর পর দেহটা দোকানদারকে দিয়া যাইতে পারিনা ইহাই দুর্ভাগ্য।

ভূত হইতেছে যে কতকগুলি রুদ্র ও ত্বষ্টা পূজক সম্প্রদায় মিলিত হইয়া মহাদেবের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই মিশনে তাহাদের মধ্যে নব শক্তির আবির্ভাব হয়। রাজপুতানার ইতিহাসে টড সাহেব এই নব-ধর্ম্ম-প্রবুদ্ধ জাতির বিজয় বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন।

মানব-সমাজ গঠন কালে যাঁহারা ঋষি পদ বাচ্য ছিলেন, তাঁহাদের বংশোদ্ভূত বেদবিদ্ সন্তানগণ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋত্বিকের পদ প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহাকে ব্রহ্মা বলা হইত। ব্রহ্মা নাম হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ উদ্ভূত হইয়া ঐ সকল বংশীয় দিগকে বুঝাইত, মনে করি। অধিকাংশ অঙ্গিরা বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইঁহারা ব্রাহ্মণ জাতি গঠন করেন। সেইরূপ মনু বংশীয়গণ ক্ষত্র ও রাজন্য নামে প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন ২ বংশ যজ্ঞে হোতার কার্য্য করিতেন। অপর সকলে রাজ্য শাসন করিতেন। ক্ষত্রিয় জাতি এইরূপে উদ্ভূত হয়। রুদ্র বংশীয় মরুৎগণ দেব-বিশ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের পূজকগণও মানব সমাজে বিশ নামের অধিকারী হন। বিশ শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের কালে গৃহস্থের গৃহে দাস রাখা পদ্ধতি ছিল। এই দাসগণ কোন্ জাতীয় ছিল সে বিষয়ে নানাপ্রকার অনুমান সম্ভব। প্রথম অনুমানঃ— দাস-জাতির উল্লেখ, ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। এই দাস জাতির সহিত আর্য্য মানব দিগের যুদ্ধ হইত। বোধ হয় যুদ্ধে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিত, তাহাদিগের মধ্য হইতে অনেককে আর্য্য দিগের গৃহে দাসের কার্য্য প্রদান করা হইত। ক্রমে ইহারা সমাজের অঙ্গীভূত হইলে শূদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমানঃ—ঋগ্বেদের কালে একজন প্রসিদ্ধ রাজার নাম সুদাস। মরুৎগণকে সুদানব বলা হইত। বৃত্রকে দনুর পুত্র দানব বলিতে দেখি। ইহারা আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। সেইরূপ অনেক দাস জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা আর্য্যশত্রু ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, দাস ও দানব শব্দে সু উপসর্গ যোগ করিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের ও দেবতাদিগের নাম রাখিতে ঘৃণা বোধ করিতেন না। বসিষ্ঠ ঋষি এক স্থলে আপনাকে দেবতাদিগের দাস বলিয়াছেন। অতএব আমরা অনুমান করি আর্য্য দিগের বিশের মধ্যে এক সম্প্রদায় ছিল যাহারা আর্য্য ধনবানদিগের গৃহে দাসের কার্য্য করিত। ইহারা ঋগ্বেদের কালে ভিন্ন জাতি রূপে পরিগণিত হয় নাই। ইহাদের নাম হইতেই অনার্য্য আর্য্য-শত্রুগণ 'দাস' নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনার্য্য দাস জাতি ও আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা দাস্য বৃত্তি করিত তাহারা এক নহে। ক্রমে আর্য্য বংশীয় দাসগণ 'দাস' নামে বোধ হয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। ইহার মীমাংসা হয় 'শূদ্র' শব্দের ব্যবহার দ্বারা। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে শূদ্রগণ বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা এই সময়ে সমাজে নির্দ্দিষ্ট জাতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। যখন ঋষিগণ এই মীমাংসা করেন, তখন সম্ভবতঃ অনেক অনার্য্য জাতিও আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং নবপ্রতিষ্ঠিত শূদ্র সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

অশ্রু।

হেমন্ত আজ শিশির কণা
দিচ্ছে ঢেলে নয়ন কোণে,
শীতল হাওয়া হৃদয় মাঝে,
মলয় পবন ডাক না শোনে!
উষার রাব নাই সে ছবি
বিষাদে আজ আঁধার মাখা!
স্মৃতি দেবী বিরস মনে
ভুলেছে সেই চিত্র আঁকা!
হৃদয় আমার ভেঙ্গে গেছে
ছিন্ন আজি বীণার তার!
মর্ম্মে মর্ম্মে বিষাদ গাঁথা
গাইনা ললিত বেহাগ আর!
ফুলের মত প্রস্ফুটীত
প্রাণের যত ভালবাসা,
চাঁপার মত প্রেম ও প্রণয়
চাতকের ন্যায় প্রাণের আশা,—
কোঁয়াসার ন্যায় বিলীন হয়ে
আজ নিমেষে গেছে চলে!
বিষাদ মনে আঁধার প্রাণে,
ভাসছি বসে নয়ন জলে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সমস্ত শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। কারণ সেটা আমার চোখের ভুল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যেন দেখিলাম, কে এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী তার ক্ষীণ তনুলতা সিক্ত নীল বসনে সজ্জিত করিয়া যখন মোতিঝিল হইতে উঠিয়া আসিয়া অদৃশ্য কোমল চরণ ক্ষেপে আমাদের বাঁধা ঘাটের উপর দিয়া পেছনে আম্র কুঞ্জের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন আকাশের চাঁদ অস্ত শিখরে অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপর মৃদু অন্ধকারের যবণিকা নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিতে ছিল!

আমি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি দেখচেন?" ডাক্তার স্বপ্নাবিষ্টের মত উদাস ভাবে বলিলেন,—স্বপ্ন!

কিছুক্ষণ আমি ও ডাক্তার দুই জনেই মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

তারপর ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এই সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌর হীরাটী ফিরোজাকে তার স্বামী যৌতুকের মধ্যে দিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া ফিরোজার শ্বশুর তার স্বামীকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলে ফিরোজাকে লইয়া তার স্বামী মুর্শিদাবাদে পালাইয়া আসেন। কিছুদিন পর, ফিরোজার স্বামী চলিয়া গেলেন; যৌতুকের হীরাটী যাইবার সময় সঙ্গে নিয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু ফিরোজা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। মেটিয়াবুরুজে ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলেন বটে কিন্তু এই হীরাটী লইয়া স্বামী স্ত্রীতে জন্মের মত বিচ্ছেদ হইয়া গেল।

ধুনকরের নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে ফিরোজা আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছিল, শুধু তার দুটী সুন্দর আদেশ। প্রথম আদেশটী এই যে আমি যদি কখনো ডাক্তারী পাশ করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসি, তবে নিজ ব্যয়ে ধুনকরদের চিকিৎসার ভার আমাকে লইতে হইবে। স্বামীর স্নেহে আজন্ম বঞ্চিত থাকিয়া যার গৃহে ফিরোজা তার দুঃখের জীবন এমন নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করিয়া চলিয়া গেল, এই মনোরম আদেশ টীর ভিতর দিয়া সে সমগ্র ধুনকর সমাজের উপর তার অসীম কৃতজ্ঞতা কি মধুর ভাবেই না চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গেল!

আমার প্রতি তার দ্বিতীয় আদেশটী আরো গভীরতর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত! সেটী ছিল এই যে আমার ধর্ম্মমত যাই কেন হোক না, আমি যদি প্রতি মৃত্যু তিথিতে সমাধির উপর ফুলের অঞ্জলি দিয়া খোদাতাল্লার নিকট পরলোকে তার সুখের কামনা করি, তবে তিনি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পরলোকে তাকে সুখী করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস লইয়াই সে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তার পরলোকের সুখের ভার আমার উপর রাখিয়া সে যেন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াই মরিয়াছে!

আমি নাস্তিক। আমার জীবনের উপর দিয়া এই যে ঘটনার ঝড়গুলি বাহিয়া গিয়াছে, তারি ভিতরে তোমাদের ঈশ্বর আমার চক্ষে চিরকালের মত শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছেন!

কিন্তু একটা কথা! আমার উপর খোদাতাল্লাকে ডাকিবার ভারটী রাখিয়া পরলোকে সুখের আকাঙ্ক্ষাটী লইয়া কি নিশ্চিন্ত মনেই সে চলিয়া গিয়াছে! আমার উপর তার চিরদিনের অখণ্ড বিশ্বাস টুকু রাখিয়াই সে এ জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে। আমার মনুষ্যত্বের উপর যদি তার স্নেহের দাবী কিছুমাত্র থাকে, তবে আমি নাস্তিকই হই, আর যাই হই, ফিরোজার চক্ষে বিশ্বাস ঘাতী হইবার আমার কি অধিকার আছে! আমাকে দিয়া ইহলোকে সে যা পায় নাই, পরলোকে যদি সেই টী পাইবার আশা করিয়া থাকে, তবে তার সেই অটল বিশ্বাস টুকুর জন্য আমি ঈশ্বর কে কেন, সয়তানকেও আরাধনা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ধারণা এই যে ফিরোজার চক্ষে জীবনে মরণে বিশ্বাসঘাতী হওয়ার ভিতরে আমার যে অধর্ম্ম, তা আমার হৃদয়হীন নাস্তিকতাও কখন সইবে না!

ফিরোজার বিশ্বাসের উপর আমার কোনো হাত নাই। কিন্তু তার আদেশ কি আমার সমুদয় নাস্তিকতা অপেক্ষাও বড় নয়? সেই জন্যই আজ তার মৃত্যু বাসরে যখন আমি ফিরোজার হইয়া খোদাতাল্লাকে ডাকিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক, সে সম্বন্ধে তুমি মনে কোনো সন্দেহ আনিও না।"

তিনি যখন তাঁর সুদীর্ঘ কাহিনী এই বলিয়া শেষ করিলেন, তখন আমি আস্তিক নাস্তিকের ভিতরে কিছুমাত্র তফাৎ না দেখিতে পাইয়া ভক্তির সহিত তাঁর পবিত্র পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ভোরের আলোয় সদর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনো ডাক্তার সেই মোতিঝিলের বাঁধা ঘাটেই মগ্ন মুগ্ধের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

—:০:—

তাঁহারা জানেন, এই মহাত্মার মনোপ্রকৃতির স্তরে স্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা যেন গ্রথিত রহিয়াছিল। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বকে তিনি যেমন জীবনের ভিত্তি স্বরূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিকে মুক্তিদিবার জন্য, এবং তাঁহার দৈন্যপীড়িত স্বদেশের দুঃখময় ঐহিক জীবনকে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্য, যুক্তিমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচলিত করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি কঠোর সাধনা এবং অশ্রান্ত ত্যাগের ইতিহাস,—অথচ তিনি সংসার বিমুখী ছিলেন না, ন্যায়োপেত ভোগ হইতে তিনি নিজেকে এবং অন্যকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেন না। তাই জীবনের সায়াহ্নে ইংলণ্ড প্রবাস কালে এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে যেমন ঐ দেশীয় ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরদের সংসর্গ করিতে দেখি, তেমনি সে সময়কার বিখ্যাত অভিনেত্রী Mr. Kembleএর সঙ্গে প্রীতি-সম্ভাষণ করিতে, তাহার অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখি। কারণ, রামমোহনের আদর্শ সেই প্রাচীন ঋষির আচরিত আদর্শ :—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদ উভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মা গৃধঃ, কস্য স্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানহীন কর্ম্মাসক্তি, কর্ম্মবিহীন জ্ঞান বা বৈরাগ্য, প্রত্যেকটিই আমাদের ধ্বংসের হেতু। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের, অনুরাগ ও বৈরাগ্যের, ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য, ঐহিক ও পারত্রিকের সমন্বয়ই আমাদের মুক্তির,—ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তির—একমাত্র উপায়।

কিন্তু এই প্রাচীন আদর্শ হইতে আমরা বহুকাল স্খলিত হইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম—এই আদর্শ এতকাল "রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র মাঝে" রুদ্ধ হইয়া ছিল, জীবনের পরিচালনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল না। তাই আজ মানুষের এত দুঃখদৈন্য, এত ভয়ভাবনা। তাই, যে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তিমন্ত্র, জগৎব্যাপী গণতন্ত্রের ভাব এবং মানবের ভ্রাতৃভাব প্রচার করিতেছিল, কার্য্যতঃ তাহা হইতে এক সর্ব্বসংহারক হলাহল উদ্ভূত হইয়াছে। তাই আজ "জাতিপ্রেম নামধারী প্রচণ্ড অন্যায় ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বন্যার।" ফলতঃ দুষ্পূরণীয় ভোগস্পৃহামূলক বিশালকায় কর্ম্মান্ধতা প্রতিদিনকে অপঘাত মৃত্যুরদিকে দ্রুত লইয়া যাইতেছে। আর এদিকে, পরুষকারহীনতা কপট সাত্ত্বিকতা ও বৈরাগ্যের ছদ্মনামে সমগ্র ভারত-বর্ষকে জড়ভরতে পরিণত করিয়াছে, যাহার ফলে মৃত্যুর অসংখ্য দূত সকল—দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি—দিবারাত্র বক্ষের শোণিত শোষণ করিয়া আমাদিগকে কঙ্কালসার করিতেছে!

এই আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে জগতকে রক্ষা করিবে কিসে? আধুনিক জগতে এই বিষম প্রশ্নের, এই জীবন মরণ সমস্যার সদুত্তর মহাত্মা রামমোহন প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের রূপকের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলে বলিব—ভোগকর্ম্মরূপী যে পক্ষীটি আজ পশ্চিম সমুদ্র তীরে স্বাদু ফলাস্বাদনে তন্ময় হইয়া আছে তাহাকে তাহারি নিরাহারী ত্যাগরূপী সখাটির সঙ্গে আবার অচ্ছেদ্য সখ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া সমাজবৃক্ষে সমারূঢ় করিয়া দিতে হইবে। রজোপ্রধান, কর্ম্মময় প্রতীচ্য সভ্যতা এবং ধ্যান-জ্ঞান-প্রধান প্রাচ্য সাধনার পরিণয় হইতে ভবিষ্যতে যে অভিনব সভ্যতা জন্মলাভ করিবে তাহার সম্ভাবনীয়তা কত ইহা কে গণনা করিবে? এই শুভ পরিণয়ের সূত্রপাত মহাত্মা রামমোহন আপনার জীবন দ্বারা করিয়া গিয়াছেন; এবং গৌরবের বিষয়, তাঁহারি আধ্যাত্মিক বংশধর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহারি পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মানবজাতির সেই প্রত্যাশিত পরিপূর্ণ সুপ্রভাতকে নিকটবর্ত্তী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন ও করিতেছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায় শুধু নবভারতের জনক নহেন, তিনি জগতের নব সভ্যতার প্রবর্ত্তক, যে সভ্যতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সকলপ্রকার দ্বন্দ্বদ্বেষ

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত গুলিতে রাগ-রাগীণীর বিশেষ একটা আড়ম্বর নাই ;—অধিকাংশ গীতই ঔদাস্য-ময় ভাটিয়াল রাগিণীতে গীত হইয়া থাকে। যেমন রাগ-রাগিণীর আড়ম্বর নাই,—তেমনি,—বাদ্য যন্ত্রাদিরও আড়ম্বর নাই। খমক, খঞ্জনী, রাম করতাল, রসমাধুরী, ও একতারাই এই গীতের প্রধান বাদ্য যন্ত্র। সময় সময় সারিন্দার ব্যবহার ও দেখিতে পাওয়া যায়।

বাউল সঙ্গীত, বাউল প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া গ্রন্থিত। সুতরাং উহা কষ্ট কবি কি শাব্দিক কবির কবিতার ন্যায় নীরস নহে। বাউল সঙ্গীতগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বাউল যন্ত্র যোগে, বাউল সুরে গীত হয় বলিয়া,—গৌর,—ভজন, গুরু, মনোশিক্ষা, নাম, প্রার্থনা, দেহতত্ত্ব, মান, মাথুর, বিরহ, বংশী,—গোষ্ঠ, ভোর, অভিসার, মিলন, নিবেদন প্রভৃতি বহু লীলা সঙ্গীত বাউল সঙ্গীতের অন্তর্ণিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রূপ,—জল ভরার তো আর কথাই নাই। এখন বাউল সঙ্গীত বলিতে গেলে গ্রাম্য কবির বাউল সুরে রচিত এই সকল লীলা কীর্ত্তন গুলিকেও বুঝায়।

বাস্তবিক খাটি বাউল,—প্রাণের ভাব-বৈচিত্রের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র। সকল স্থলে তাহা বুঝিতে ও পারা যায় না। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি লিখিতেছি।

"মড়া মাইন্‌ষে আহার করে জীতা মাইন্‌ষের পেটে।"

"সমুদ্রেতে রোপীলাম কলা, তারে নিল সুতে। গঙ্গা মৈল জল তিরাষে, ব্রহ্মা মৈল শীতে॥"

"আগেত জন্মিনাম আমি, পাছে জন্মিল্ ভাই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা জন্মিল, বাপত জন্মিল নাই॥"

"পানীর তলে পাথর মুর্‌সীদ্ তারে খাইল ঘুণে। তুজকে পড়িয়া বন্দা বেত্তের খবরটানে॥" ইত্যাদি।

সচরাচর এই প্রকারের বহু গান শুতিতে পাওয়া যায়।

বাউল তাঁর বাউল প্রাণ লইয়া, কোন্ ভাব সমুদ্রের কোন্ রস—তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া, এইরূপ অসম্ভব উক্তির অবতারণা করিলেন,—মায়িক জগতের মানুষ আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

লীলা রসাত্মক বাউল সঙ্গীত গুলি একতারা, রস মাধুরী ও খমক খঞ্জনী যোগে গীত হইয়া পল্লীস্থ নর নারীর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে, মন প্রাণ উদাস করিয়া তোলে। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক নিম্নে আমি কয়েকটি বাউল সঙ্গীত লিখিয়া দিতেছি।

১। সরল ভাবে এক দিন গুরুর নাম নিলে না,—
কেন রে মন সরল হৈলে না।
কয়বার আইলে, কয়বার গেলে মন্‌রে!—
গুরুর চরণ একবার ঠিক্ পেলে না॥
গেল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,
মন্‌রে চাইর যুগে এক খান দিন পেলে না।

২। গোসাইজী কোন্ রঙে বেন্ধেছ ঘর খানি,
মিছে কর ধান্ধা বাজী।—(গোসাইজী কোন্ রঙে)
বালা না কাল গেল হাসিতে খেলিতে
যৌবন কাল গেল হেলে,—
বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে,
গুরু ভাবব কোন্ কালে। (গোসাইজী কোন্ রঙে)
দেহের মাঝারে ফুলের বাগিচা
ফুটিলে সুগন্ধ করে,—সুজন চাহিয়া করও পিরীতি,
মৈলে যে জীয়াইতে পারে॥ (গোসাইজী)
দন্ত পড়িল, চুল পাকিল, যৌবনে দিয়াছে ভাটি,—
দিনে না দিনে খসিয়া পড়িছে রঙ্গীলা দশানের মাটী।
(গোসাইজী)

৩। দয়াল গুরু আমার গো!
কোন্ সময়ে কোন্ ভাবেতে কোন্ কথা বলে।
দেহে আছে ছয়টী রিপু—ছয় জন ছয় পথে চলে॥
বৃন্দাবনে আছে তিন রতি,—
কোন্ রতি সাধন করিলে, অন্তে হয় গতি,—
কোন্ রতি সাধন করিলে কোন্ রতি উজান চলে॥

৪। আমার নাও যে গাঙ্গে ডুবে না,—
আরে মাঝি খবরদার।
মহাজনের জিনিস ভরা রে,—
একটুক নিকাশ রাইখো তার।
(আরে মাঝি খবরদার।)
মস্তলেতে কল ঘুরাইয়া আসে পাশে চাইও,—

আপনা দেশের মানুষ পেইলেরে,—তারে মন খুলে দেখাইও
(রে,—আরে মাঝি)

৫। ধর্ ধর্ মন্ ঠিক্ করে ধর।
ওরে,—চেতন গুরুর সঙ্গ কর ॥
চেতন গুরু, কল্পতরু চেতন থাক্‌তে স্মরণ কর,—
রাধার নামে বাদাম দিয়ে কিনারা ভিড়াইয়া ধর।
কাম নদীতে তুফান ভারি দেইখে আমার করে ডর,
গুরুর নামটি স্মরণ করে ঝট্ করে মন বৈঠা ধর ॥

৬। মিছা ধান্ধা বাজী এ সংসার, মন্‌রে, ভরসা কর কার?
ভেইবে দেখ মনে মনে তুমি বা কার? কেবা তোমার?
(মন্‌রে ভরসা কর কার?)
এই যে তোমার সাধের বাড়ী ঘর,—
পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় নফর,
সব পড়ে রবে, দিন দুপুরে চক্ষে দেখ্‌বে অন্ধকার ॥
প্রাণান্ত কাল যখন হইবে,—
হরি হরি বলে সবে বাহিরে নিবে,—
দেহ চিতায় তুলে, আগুন জ্বাইলে
পুড়িয়া কর্ব্বে অঙ্গার ॥ (মন্‌রে ভরসা কর কার?)

৭। দয়াল গুরু ভাসাইলা অকুল সায়রে।
গুরু গো!—কেউরে দিলা ইন্দ্রপদ,—কেউরে কমল কলি।
কেউরে দিলা রাজ সিংহাসন,—
কেউ নামের কাঙ্গালী গো ॥
গুরু গো,—অকুল সমুদ্রের মাঝে
ছাড়িয়া দিলাম তরি,—
গুরু নি হইবা আমার,—ভাঙ্গা নায়ের কাণ্ডারী গো ॥

৮। বড় আজ্‌গুবী কল্ গৌর চান্দের ঘরে,—
ঘরে গো সখি।
প্রেমের ঘরে রসের তার, দেখতে লাগে চমৎকার,—
প্রেম কি মিলে গায়ের বল জোরে,—
যে ধইরাছে আসল তারে,
ঝর বাতাসে পায়না তারে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া আছে,—তারে তারে তারে গো সখি।

৯। মন্ তোর্ দ্বিদলে লুকায়ে রৈল কেরে?
প্রেম ডোরে, বন্ধন করে,—তাঁরে রূপের ঘরে নেরে।
চতুর্দ্দল, ষড়দল, দ্বাদশ দশম দল,
দলের উপর দলে শোভা করে,—
উভা নালে ভাটা খেলে মৃণালের উপরে।

* * *

১০। ধর্‌বেরে অধর, ধর্‌বে যদি মনের মানুষ,
আগে তোর্ পাটুনী ঠিক্ কর।
ভাইরে ভাই,—দীক্ষা নাই শিক্ষা নাই আগেই কল্লে বিয়া।
বিনমুসারায় চাকর হৈলেরে,—কেবল গাঁইটের পয়সা
দিয়া রে।
ভেল্লা কাষ্টের নৌকাখানি মাইঝ খানে তার ছুঁইয়া।
আগাপেকে পাছায় যাইতে রে;
নায়ের গলই পড়ে খইয়া রে ॥
(আগে তোর পাটুনী ঠিক্ কর্।)

১১। দিন গেল, হরি বল, ওরে পাষাণ মন!
কর তাঁর নিরূপণ, হয়ে সুচেতন,
তুমি না বুঝ্ আবার খুঞ্জ, ধরে প্রেমের মহাজন ॥
(গৌর উজ্জ্বল প্রেমরে।)
ও মন, শিখ থুইয়ে বুঝ কি বাঁকা, এলে একা যাবে একা,—
কার সঙ্গে বা হবে দেখা,
নিকাশে মিল্‌বে যখন,—
তখন ঠেক্‌বে ঘোর বিপদে, হিসাব লবে পদে পদে,
গুরুর চরণ রাইখে হৃদে, করবে সাধ্য সাধন।
নিতাই হাটের অধিকারী,
শুদ্ধ আদালত করি,
ষোল আনা হিসাব করি, নিক্তিতে কর্ব্বে ওজন—,
যে হবে ওজনে কমা, লাগবেরে চৌরাশি জমা,—
এবার কার খেপেতে সীমা না পাইবে যেই জন ॥
মন,—আসলে আসল রহিল,
নকল বিকায়েগেল,
ফইরা সব পইড়া রৈল,—
গোল ম্যালে ঠেকে এখন,—
যদি থাক রাগের ঘরে,—ছয় জনে কি কর্ত্তে পারে,—
নিত্যানন্দের কৃপা হৈলে মিল্‌বেরে অমূল্য ধন ॥

১২। ঘর বানাইল কেমনে,—
এমন রঙ্গীলা ঘর কোন্ জনে? ভাইরে ভাই,—
এক মারুইলে বান্ধা ঘর আষ্ট গোটা ঠুনি।
দৌদ্দ রোওয়ায় চাল বান্ধিয়া চামেড়ায় দিছে ছানি ॥

লাগিল, তখন অপরটি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পূর্ব্বোক্ত ভাবে পৃষ্ঠে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে বহু সংগ্রামের পরে বলবানটী জয়লাভ করিল, সে কোকিল শাবকটি সহ অপর শাবকটি ও ডিমটি ফেলিয়া দিয়া বাসা অবসর করিয়া লইল। এবং বিমাতা দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

জীবজন্তুর পরমায়ু।

প্রাণী জগতে তিমি মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। ইহারা ১০০০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। হস্তী, ভাল অবস্থাতে থাকিতে পারিলে, ৪০০ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বিড়াল সাধারণতঃ ১৫ পনর বৎসর জীবিত থাকে। সাধারণতঃ কাঠ বিড়াল ৭।৮ বৎসর, খরগোস ৭ বৎসর, ভল্লুক ২০ বিশবৎসর, শৃগাল ১৫।১৬ পনর-ষোল বৎসর এবং সিংহকে ৭০ সত্তর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। শুকর সাধারণতঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক কে ৬০ ষাট বৎসর দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ ঘোটক ২৫।৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর জীবিত থাকে। উষ্ট্র প্রায় ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে। ঈগল পক্ষী কখন কখন এবং দাঁড় কাক অনেক সময়েই শতায়ু হইয়া থাকে। রাজ হাঁসকে ৩০০ তিনশত বৎসর এবং কুর্ম্মকে ১০৭ এক শত সাত বৎসর জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ধমনীর স্পন্দনের সহিত দীর্ঘ জীবনের সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এখন ও কোন যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নাই। দেখা গিয়াছে সিংহের ধমনীর স্পন্দন মিনিটে ৪০ চল্লিশবার ব্যাঘ্রের ৯৩ তিরানব্বই বার এবং ঈগল পক্ষী ১৬০ বার হইয়া থাকে। হস্তীর স্পন্দন গণনা করা অসম্ভব।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

জীবন্ত (উপন্যাস) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল প্রণীত, মূল্য ১৸৵০। এখানি গ্রন্থকারের দ্বিতীয় উপন্যাস। তিনি ইতঃপূর্ব্বে 'প্রহেলিকা' লিখিয়া উপন্যাস সাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানাও তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বীরেন্দ্রবাবুর রচিত উপন্যাসের বিশেষত্ব যাহা তাহা "জীবনেও" সম্যক সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। ঘটনা বাহুল্য ও নায়ক নায়িকার অনাবশ্যক চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনকেই তিনি একমাত্র উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন না। অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যূহ ভেদ করিয়া সমাজ সমস্যাগুলি কিরূপে ক্রমবিকশ লাভ করিয়া গড়িয়া উঠে এবং তাহাদের তরঙ্গাভিঘাতে সমাজ শরীর কিপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া সমাজিক ব্যক্তির চরিত্র গঠিত করে সেই সকল মনোরম চিত্র বীরেন্দ্রবাবুর উপন্যাসে আমরা পাইয়া থাকি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের সমাজের স্তরটী যে আলোড়িত হইয়াছে এবং সেই আলোড়নের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে যে কতগুলি সমস্যা সমুত্থিত হইয়া চিন্তাশীল সামাজিক গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। এই "যুগসন্ধির" কতিপয় সমস্যা গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সাধারণতঃ সমস্যামূলক উপন্যাসের গল্পাংশে চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর ন্যূনতা দৃষ্টি হইলেও 'জীবন' সেই অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রনে শিল্প কুশলতার অভাব নাই। সুরেশ, হেম, নলিনী, লীলা, সরোজ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সুরেশ চরিত্রের উপর উপন্যাসের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুরেশ—বিংশ শতাব্দীর ভাবুক ও কর্ম্মী যুবক। বিদ্যা, অর্থ, যশঃ তাহার কিছুরই অভাব নাই। তথাপি "তাহার সমস্ত দেহ প্রাণ ভরে কি এক মহাক্ষুধা বিরাজ কচ্ছে, শুধু অর্থ প্রাপ্তিতে যা মিটিবে না। এ কিসের ক্ষুধা?" সুরেশ এই মহাক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই "ক্ষ্যাপার" মত জগৎময় "পরশ পাথর" খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে তাহার সেই বুভুক্ষিত জীবনে শান্তি আসিল—ত্যাগের পথে, বহুর ভাবনায় ও স্বদেশের উন্নতি কামনায়। সুরেশের দেশ ভ্রমণের পর্ব্বটী বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে হেম - বন্ধুবৎসল, যুক্তিবাদী ও উৎসাহী শিক্ষিত যুবক। মনে হয় সুরেশের চরিত্র বিশেষ ভাবে ফুটাইবার জন্যই হেমের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নলিনী সর্ব্বাংশে হেমের উপযুক্ত গৃহিণী। তাহাদের দাম্পত্য জীবন বড়ই মধুময়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ভারত নারীর মূর্ত্তিতে যে অমৃতভাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, নলিনীই সেই অমৃতভাণ্ড। কিন্তু লীলা ঠিক নলিনীর উপাদানে গঠিত নয়। লীলা, কাঠিন্যে, মাধুর্য্যে, সত্যে, ভ্রান্তিতে দয়া ও প্রেমের পরিপূর্ণতায় অনুরূপা। তাহার চরিত্রে মিশেনারী মেমদের চরিত্রের অনেকটা ছাপ পড়িয়াছে। কারণ লীলা মিশেনারী মেমদের হাতের মেয়ে—তাহাদের আবহাওয়ায় লীলার চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই প্রগলভতা ও লজ্জাশীলতার অভাবটাই তাহার চরিত্রে

এই হীনতা মধুসূদনের নবভাবোদ্দীপ্ত বীর-হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা "চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলীর" 'আমরা' শীর্ষক কবিতাখণ্ডে প্রাপ্ত হই,—

"আকাশ-পরশী গিরি দমি, গুণবলে
নির্ম্মিল মন্দির যাঁরা সুন্দর ভারতে,
তাঁদের সন্তান কিহে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে।"

এই কবিতায়, স্বদেশের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতায় কবি-হৃদয়ের অসহনীয় আত্মগ্লানি যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাতে ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সঙ্গে কবির বাল্যরচনা "King Porus—a legend of old" নামক বীররসোদ্দীপক ইংরাজী কবিতাটিও পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের প্রতি ও প্রকৃত বীরত্বের প্রতি কবিবরের কি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

সমস্যা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের দূষিত বায়ু শোধন জন্য জগবন্ধু বাবু প্রথমেই মহকুমায় যাইয়া মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহকুমা মাজিষ্ট্রেট সকল কথা অবগত হইয়া প্রচুর সহানুভূতির সহিত তাঁহার মন্তব্য গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে হিন্দু হিতসাধিনী সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।

মহকুমার ১ম মুনসেফ অনাদি বাবু মহকুমার শাখা হিন্দু হিতসাধিনী সমিতির সভাপতি, জগবন্ধু বাবু তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা অবগত করাইলেন এবং হিতসাধিনীর হিত চেষ্টায় কোন রূপ ফল ফলিতে পারে কি না তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন।

মুনসেফ বাবু তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিয়া হিত সাধিনীর সম্পাদক শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণকে মহকুমায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ সম্মানিত লোক, অর্থবানও বটেন। ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ানই তাঁহার জীবনের কর্ম্ম। দেশ ও সমাজ-হিতৈষণা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। দেশ ও সমাজের জন্য তিনি জিহ্বা ও লেখনী ব্যয় করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবার লোক ছিলেন না। স্বার্থপর সমাজদ্রোহীজনগণের অজস্র নিন্দা তাঁহাকে কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না।

তাঁহার চরিত্রে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ লোকমুখে প্রচার হইয়াছিল,সেগুলি:—তিনি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াও নিজের বেলায় গৌরী দানের ফল লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার দীর্ঘ টিকি থাকা সত্বেও তিনি স্থান বিশেষে ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসারে আহার করিতেন; বক্তৃতা ও প্রবন্ধে আত্ম কথা প্রচারই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চিন্তা করেন কম, কথা বলেন বেশী কিন্তু যাহা বলেন তাহা মূল্যবান। ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা, শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ কাজের লোক ছিলেন। যে কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতেন, তাহা প্রাণপণ যত্নে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় তিনি কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা সমিতি স্থাপন করিতেছিলেন। শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মুনসেফ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ ক্রমে পীরপুরে যাইয়া জগবন্ধু বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া রাজনগরের রাজা বাহাদুরের নিকট গমন করেন।

এই প্রচেষ্টার ফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠ করিয়াছেন। এই অধিবেশনে যে কোন ফল হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। বক্তৃতার একটা ফল আছেই। এই এক সপ্তাহে পীরপুরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্দ্ধেক বিনা তদ্বিরে খারিজ হইয়া গিয়াছে, সম্পাদক তাহার তালিকা লইয়া আসিয়াছেন।

আজ পীরপুর ষ্টেডিং সবকমিটির প্রথম অধিবেশন। সদর হইতে প্রাতঃকালেই সম্পাদক সুশীল বাবুও সহকারী সম্পাদক মাখন বাবু আসিয়া পীরপুর পঁহুছিয়াছেন।

বল ক্ষয় হয়। হাজার দলাদলি করিলেও এটী স্মরণ রাখিবেন। আর, পরকে ধরিয়া ঘরকে শাসন করিবেন না—সময়ে তাহা ভীষণ কুফল প্রসব করিবে। ইত্যাদি।"

দুই সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ ধার্য্য হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পীরপুরের তারাপদ সন্ন্যাল সম্মানী লোক। তাঁহার পিতামহ রাজা রাজবল্লভের চাকুরী করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, সম্পর্কবাদেও তাঁহার ঘরের কোন নিন্দা নাই। তারাপদের পিতা স্বাধীন চেতা লোক ছিলেন। তিনি কাহারও চাকুরী করিয়া নিজকে অবনত হইতে দেন নাই। পুত্র ও পিতার অনুসরণে নিজ স্বাধীন মত বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন। তারাপদ বাল্যে পীরপুর স্কুলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়িয়া যৌবনে সংস্কৃত অধ্যায়ণ করিয়াছিলেন। তারপর অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন।

তারাপদের পিতা মুক্ত হস্ত ছিলেন; সে জন্য পৌত্রিক সম্পত্তি অধিক বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই—নগদ তহবিলও কিছু কমাইয়া গিয়াছিলেন। তারাপদ কৃপণ, তিনি নগদ সম্পত্তি বৃদ্ধির দিকে একান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কোষ পূরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিতেন আপোষে ক্রয় অপেক্ষা দাদনের বিনিময়ে প্রাপ্তিতে লাভ বেশী। তিনি তাহাই করিতেন। পীরপুরের ছোট বড় শত্রুমিত্র সকলেই তারাপদের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী ছিলেন। তারাপদর ঋণের তাগাদাও ছিল না, রিয়াৎও ছিল না। তাঁহার দাদনে সুদ ছিল কম, জাবিন ছিল বড়। সম্পত্তি রেহান না রাখিলে তিনি কাহাকেও টাকা ধার দিতেন না।

তারাপদের ৪টী সন্তান—১টী মেয়ে ও তিনটী ছেলে। বড় মেয়ে প্রতিমার বয়স চৌদ্দ। পীরপুর গ্রামে প্রতিমা সুন্দরী বলিয়া প্রসংশিতা। জগবন্ধু বাবুর গৃহিণী প্রতিমাকে দেখিয়া পুত্র বধু করিবার সাধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের সাধ এখনও লয় পাইয়া যায় নাই। জগবন্ধু বাবু নূতন সম্পত্তি ক্রয় কালে যে পাঁচ হাজার টাকা তারাপদ সন্ন্যাল হইতে ধার করিয়াছিলেন, জগবন্ধু বাবুর ইচ্ছা—তারাপদ কন্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে সে টাকার তমশুক খানাও ছাড়িয়া দেন। কৃপণ—তারাপদ এতগুলি টাকার বিনিময়ে এত বড় পাসকরা ছেলে চায় না; সে চায় পাঁচ সাতশত টাকার মধ্যে যেমন তেমন পাত্র; তাই মেয়ের বয়স চতুর্দ্দশে উঠিয়াছে।

তারাপদ সে জন্য চিন্তিত নহেন। দুই এক বৎসর সবুরে যদি ২।৪ হাজার টাকা বাঁচিয়া যায়, চৌদ্দ বছরে আসিয়া যাইবে কি? সে তো এখন ঘরে ঘরেই আছে।

প্রতিমার ছোট-তিনটী ভাই। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স ২১ দিন। তাঁহার মাতা সেই নব প্রসূত শিশুকে লইয়া সুতিকা গৃহে আছেন। তারাপদর বয়স ৪০, দেহ বলিষ্ঠ। তাঁহার বৃদ্ধামাতা এখনও জীবিতা। বেশ সুখের সংসার।

পীরপুরের সামাজিক সমস্যায় তারাপদ জীবন তর্করত্নের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সভার হাঙ্গামায় তারাপদ সসম্মানে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশেও এক ঘা পড়িয়াছিল; বয়স্থ দিগকে রক্ষা করিতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন বেশী, সেজন্য আত্ম রক্ষার দিকে তাঁহার দৃষ্টি কম ছিল। যাই হউক ব্যাপার লজ্জা জনক হইলেও পীরপুরের পক্ষে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক এবং অচিন্তনীয় ছিল না।

সভা ভঙ্গের পর তারাপদ ও জগবন্ধু বাবু একত্রে বাড়ী যান। স্কুলের মাঠ পার হইলেই জগবন্ধু বাবুর বাড়ী, তাহাহইতেও আর একটু দূরে সন্ন্যালদের বাড়ী।

জগবন্ধু ডাকিলেন "এস ভায়া ত'মাকটা খাইয়া যাও।' বলিয়া তিনি তামাক ডালিলেন।

"না—আপনার আর, তামাকটা খরচ করিয়া লাভ কি—বাড়ী যাই, হয়ত বক্ষে পাদুকা ঘাত ও পৃষ্ঠে লগুড়াঘাতের সংবাদ পাইয়া গৃহিণীর ধনুষ্টংকার হইয়াছে।" বলিয়া তারাপদ হাসিয়া ফেলিলেন।

জগবন্ধু বলিলেন—"দেখ দিখি কি অমানুষিক কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা বলে কি? এ কি ভদ্রলোকের গ্রাম, না চাষা ইতরের গ্রাম?"

শ্মশান বন্ধু।

(১)

অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ লোহিত আভাটুক বক্ষে নিয়া খরস্রোতা পদ্মা নাচিতে নাচতে কোথায় কোন্ প্রিয়তমের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের কোন বিঘ্নই আজ তাহার মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। বিঘ্ন যত কঠোরই হউক না কেন, বাঞ্ছিতের পদ প্রান্তে তাহাকে পঁহুছতেই হইবে, তাই তাহার গতি উদ্দাম, একটানা সে কেবলি চলিয়াছে।

শরতের নির্ম্মল আকাশের নীচে গোধূলির শুভক্ষণে পদ্মাতীরে বসিয়া যাদব শূন্য দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছে? তাহার মুখ মণ্ডলে চিন্তার রেখাগুলি স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; দেখলেই চিন্তার গভীরতা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যুবক বাহ্য জ্ঞান শূন্য। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে অনন্ত জলরাশী, ভিতরে ও অনন্ত চিন্তা তরঙ্গ যুবকের প্রাণের মধ্যে এক বিরাট উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। জাগতিক সৌন্দর্য্যের কিছুতেই তাহার মন আকৃষ্ট হইতেছে না—অভিসারিকা পদ্মার মতই যাদবের চিন্তা-স্রোত একটানা চলিয়াছে।

যাদবের সহপাঠী জগদীন্দ্র নাথ বন্ধুর তালাসেই নদীর তীরে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল। যাদবকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে আসিয়া ঘাড়ে ধরিয়া বলিয়া উঠিল "ষ্টুপিড্ এতক্ষণ তোকে খুজিয়া হয়রাণ, একলাটী বসিয়া বুঝি পদ্মার ঢেউ গণা হইতেছে?" তাহার চিন্তা ক্লিষ্ট মুখের উপর দৃষ্টি পরিতেই জগদীন্দ্র নিতান্ত অপরাধীর মত যাদবের মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না।

কয়েক মিনিট পরে জগদীন্দ্র পরম আত্মীয়ের মত স্নেহাস্পদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জড়িত স্বরে বলিল "ভাই তোমার চোখ ছল ছল করিতেছে কেন? এমন ত কোন দিন দেখি নাই—বিষয়টা কি বল দেখি?" যাদব কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে জগদীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন এমন হয়? আচ্ছা তুমিই বলনা, কেন এমন হয়?" "ব্যাপার কি সেটা না জানিলে কেমন করিয়া বলিব, কেন হয়? বিষয়টা খুলিয়া বলনা"। বলিয়া জগদীন্দ্র মহা উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের প্রতীক্ষায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া যাদব বলিতে লাগিল—"বলিতে ছিলাম কি, একই ভগবানের সৃষ্টিতে এতটা পার্থক্য হয় কেন? বলবান্ দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিতে এত তৎপর কেন? কেনই বা মানুষ স্বাভাবিক শান্তির উপর একটা অশান্তির ছায়া ফেলিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে? এ হীন প্রয়াশ কেন?" বলিতে বলিতে যাদবের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বন্ধুর চোখে জল দেখিয়া জগদীন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। যাদবকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া পরম স্নেহ ভরে সমস্ত বিষয়টা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিতে গিয়া তাহার নিজের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আলো ও আঁধারের মহা সন্ধিক্ষণে এ কি স্বর্গীয় দৃশ্য। কি স্বর্গীয় সহানুভূতি!

যাদব বলিতে লাগিল "জগদীন্দ্র! তোমার নিকট সমস্তই খুলিয়া বলিব, কারণ তোমার মত সুহৃদ আমার দ্বিতীয়টী নাই। তোমার নিকটই পরামর্শ চাহিতেছি, সৎপরামর্শ দিয়া দারুণ চিন্তা হইতে আমাকে রক্ষা কর। বাবার ইচ্ছা আমরা সপরিবারে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করি। আমার অভিপ্রায় আগামী কল্যই তাঁহাকে জানাইতে হইবে। এখন উপায় কি ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি"।

"কেন? তোমার পিতা খৃষ্টান হবেন কেন?"

"কেন?—সে অনেক কথা। জানইত বাবার মত ধর্ম্ম ভীরু লোক আমাদের সমাজে খুব কমই আছে। বুঝতেই পার, কতটুকু মনের কষ্টে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। কি গভীর বেদনা যে তাঁহার হৃদয়কে অহরহ বিদ্ধ করিতেছে, সে আমি কতকটা বুঝিতে পারি। কতদূর অবিচারে আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে, যাহার জন্য পিতৃপুরুষের দারুণ অভিসম্পাতে আমাদিগকে দগ্ধ করিবে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত দেওয়ার অধিকার আমাদের থাকিবে না। তথাপি আজ বাবা আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাহার কারণ কি জান?

পুত্রকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। কে আজ বিপদ মাথায় করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাহায্যে অগ্রসর হইবে? তিনি স্বয়ং বৃদ্ধ, একা কি করিবেন? ডাক্তার ডাকিতে যাইবেন, না রোগীর পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিবেন? এদিকে রোগীর নিকট বসিয়া দুইটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে হয়। আজ তাহার মহা বিপদ। ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইতেছেন না।

বিপদের মধ্যে পড়িয়া আজ তাঁহার জগদীন্দ্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে গ্রামে থাকিলে কখনই আমার এ বিপদ উপেক্ষা করিতে পারিত না। সেত গ্রামের ছোট বড় সকলের বিপদেই প্রাণ পাত করিয়া সাহায্য করিত! আমি সমাজের নেতা, অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া তাহাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, ভগবান আজ আমার উপযুক্ত সাস্তিই দিয়াছেন।"

ভাবিয়া ভাবিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। এমন সময় দরজায় পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়াই দেখিতে পাইলেন, জগদীন্দ্র নাথ সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি বিস্ময়ে স্বপ্না বিষ্টের মত জগদীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভাবিলেন এ স্বপ্ন। ক্ষণিক পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, এ প্রকৃতই সত্য, তখন এক লম্ফে উঠিয়া জগদীন্দ্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—এসেছিস্ বাবা? আজ আমার—" আর বলিতে পারিলেন না কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জগদীন্দ্রের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগলেন। জগদীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"আসিবনা? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমিত সমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহার সঙ্গেই যে আমার আশৈশব সম্বন্ধ; এই মাটিতেই যে আমার জন্ম—আমার তীর্থক্ষেত্র! গ্রামের এই দুরবস্থার সংবাদ গ্রামান্তর হইতে শুনিয়াই কতদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমার কি আর অভিমান করিবার সময় আছে! যাক্ সে সব কথা—সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা করুণ, আপনি যে আমার পিতৃ স্থানীয়।"

মৃত্যু যাহার দ্বারে, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। জগদীন্দ্রের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্ত্রী অমর লোকে চলিয়া গেলেন। সাধ্বী মৃত্যুর পূর্ব্বে জগদীন্দ্রকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। জগদীন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের একমাত্র পুত্রটী আরোগ্যের পথে দাঁড়াইয়াছে। সে যে মাতৃহারা হইয়াছে একথা তাহাকে জানিতে দেওয়া হইল না।

মৃতার সৎকার এখন মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের কেহই ভয়ে মড়া পুড়াইতে স্বীকৃত হইল না, অধিকন্তু গ্রামস্থ প্রায় সকলের বাড়ীতেই কেহ না কেহ কাতর। এই সব অজুহাতে কেহই আসিল না। জগদীন্দ্র তাঁহার বন্ধু যাদবের এবং নিম্নশ্রেণীর আরও কয়েক জনের সাহায্যে বাঁশ কাঠ প্রভৃতি শ্মশান ঘাটে লইয়া গেল। তৎপরে বিদ্যানিধি মহাশয় এবং জগদীন্দ্র একযোগে মৃত দেহ শ্মশান ঘাটে লইয়া গেলেন।

জগদীন্দ্রনাথ একাকীই সমস্ত আয়োজন করিয়া মৃত দেহ চিতায় তুলিয়া দিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া অস্পৃশ্য চণ্ডাল যাদবকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন "বাবা! আজ আমাকে খুব শিক্ষা দিয়াছ, আমার সহধর্ম্মিণীর শ্মশান বন্ধুর কাজ করিলে। সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া আমাকে ক্ষমা কর। আজ শ্মশান ভূমেই আমাদের মনের মলীনতা বিসর্জ্জন দিয় গেলাম।"

যাদব বিদ্যানিধি মহাশয়ের পদধূলি মস্তকে তুলিয়া নিল। পুনরায় বিদ্যানিধি মহাশয় যাদবকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে সহস্র চুম্বনে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন। বাবা তুমি আমারও শ্মশানবন্ধু।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর সরকার।

কাবুলে বাঙ্গালী।

কাবুলীওয়ালা ভ্রমণকারী সওদাগর দেখিয়া আমরা কাবুলের স্বল্প অনুভব করি। ফলে কাবুল দেশ নহে, উহা আফগানিস্থানের রাজধানী। এই সে দিন কাবুলের আমীর হবিবুল্লার হত্যায় আমরা ঘরে ঘরে কাবুলের

আমি সাক্ষাতের অনুমতি পাইলাম। একজন কর্ম্মচারী আমাকে আমীর সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। সেটা ইংরেজী ধরণের বৈঠক খানা। আমীর সাহেব আমার পরিচয় লইলেন। তিনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সব কথাই রাজনীতি সংক্রান্ত।

প্রথম যখন ইংরেজেরা সে দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন তখন সেখানকার সর্দ্দারেরা উত্তেজিত হইয়া আমীরের নিকট গিয়া উহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া দিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। আমীর সাহেব সকলকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন—"ইংরেজ আমার বন্ধু আমি তাহাদিগকে বাণিজ্য ও খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছি। এখন উহাদিগকে স্থান করা তোমাদের হাত। তোমরা যদি তাদের ধর্ম্ম বক্তৃতা না শোন আর তাদের দ্রব্যাদি ক্রয় না কর, তবেই আমারও বন্ধুতা রহিল,আর তাহারাও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।" তাহাই হইল ইংরেজ ধর্ম্মযাজক ও সওদাগরেরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমীর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর হইতে প্রত্যহ আহারের জন্য আমি সরকারী সিধা পাইতাম। এক বেলা অন্ন ও অন্য বেলা লুচি বা রুটী খাইতাম। প্রত্যহ কালীবাড়ী হইতে বলিদেওয়া একটা করিয়া পাঁঠা পাইতাম, প্রচুর দুধ আসিত, আমাদের দুই জনের জন্য প্রত্যহ দুই সের করিয়া মদ আসিত। এ মদ খাইতে বড় সুস্বাদু, বেশ তৃপ্তি জনক। মহুয়া ও কদলী দ্বারা প্রস্তুত মদ পাইতাম। সে দেশীয়দের মদ্য পান করিলে দণ্ড হয়। বিদেশীয়েরা মদ্য ক্রয় করিয়া খাইতে পারে।

আমার পোষাক দেখিয়া আমীর সাহেব কহিলেন "এ ত তোমার বিদেশীয় ইংরাজী পোষাক; তোমরা কিরূপ পোষাক ব্যবহার কর?" আমি আমাদের ধুতি চাদরের কথাটা বুঝাইতে পারিলাম না। বলিয়াই পরদিন বাঙ্গালী পোষাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের আদেশ করিলেন। আমি পরদিন বাঙ্গালী পোষাক পরিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে দেখিয়া পথের বালক বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমীর সাহেব আমার বাঙ্গালী পোষাক দেখিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন। যখন ঐ সকল কাপড়ও বিলাতি বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আমাদের হতভাগ্য দেশের জন্য বড় দুঃখিত হইলেন। দূরদর্শী আমীর সাহেবের রাজনৈতিক কথা শুনিয়া অবাক হইলাম। আমীর সাহেবের নিকট আমার সমাদর দেখিয়া কাবুলীরা আমাকে ইংরেজের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিয়া প্রকাশ্যে আমাকে খাতির করিত,মনে মনে কি ভাবিত—সে চিন্তা করি নাই। আমরা দেশে যে সময় যে সকল কাবুলী দেখি, উহারা অভদ্র ও ইতর শ্রেণীর। কাবুলী ভদ্রলোকেরা অতি উচ্চ দরের এখানে কয়েকটী ইংরেজী নবিশ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা পঞ্জাব প্রবাসীবাঙ্গালী, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা, পরিচ্ছদ সব ভুলিয়া গিয়াছেন বলিলেই হয়। বাঙ্গালায় কখনো আসেন না পঞ্জাবের প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত বিবাহাদি করেন।

আমীর আবদর রহমানের দেহ খুব বলিষ্ঠ ছিল। আমি যখন হিমালয়ের গড়োয়াল প্রদেশে দেরাদুন ও ঋষিকেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন কাবুলের পূর্ব্বতন আমীর দোস্ত মামুদ খাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি আমীর আবদর রহমানের পিতৃব্য, তিনি তখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দোস্তমামুদকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি ঋষিকেশ অঞ্চলে শিকারে বাহির হইয়াছিলেন, বহু অশ্ব, হস্তী তাঁহার সঙ্গে। কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ তাঁহার রক্ষী ছিল; বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার কারাগার, সাম্রাজ্য রক্ষণ করিত। সেই সময় কাবুল হইতে অনেক লোক ভারতের পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এখন সে দোস্ত-মামুদ ও আব্দর রহমান কেহই ধরাধামে নাই। আমি আমীর দোস্ত-মামুদকে তাঁহার প্রাচীন অবস্থায় দেখিয়াছি, তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ রূপরাশি দেখিয়া বাস্তবিকই ভক্তি হইয়াছিল। দোস্ত-মামুদের এই ব্যয়টা কাবুল গবর্ণমেণ্ট হইতে ইংরেজ রাজের হাত দিয়া আসিয়া খরচ হইত।

কাবুলের ভাষা পুস্ত, উহা উর্দ্দু বা হিন্দির সঙ্গে মিলেনা। তবে কাবুলীরা উর্দ্দু ও হিন্দি কিছু কিছু বুঝেন। প্রায় সকল ভদ্রলোকই কিছু হিন্দি জানেন। কাবুলে

খানা জাহাজ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই অগ্ন্যোদ্‌গমের ভীষণ বিদারণ শব্দ ৩ হাজার মাইল দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। এই শব্দে ১০০ মাইল দূরবর্ত্তী দালানের কাচের জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়াল ফাটাইয়া এবং গ্যাস্ নির্ব্বাপিত করিয়া এক বিভৎস কাণ্ড করিয়াছিল। শব্দ তরঙ্গ কয়েকবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। পর্ব্বতের যে বিশাল অংশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিল উহার বেগ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। এই ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ৩৬৩৮০ জন লোক সহ বহু নগর ও পল্লি ধ্বংস হইয়াছিল এবং দুইটী আলোক গৃহ উৎপাটিত হইয়াছিল।

উক্ত কারণে এনজের সহরে যে জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহাতে যে ২।১ জন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাদরী নিল্ একজন। তিনি সেই প্লাবনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"আমি ভোর ৬ টার সময়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছিলাম। যদিও গত কল্যের অন্ধকার কতক বিদূরিত হইয়াছে কিন্তু তখনও পরিষ্কার আলো হয় নাই। আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই এক পাহাড়ের মত কাল জিনিষ তীরের দিকে আসিতে দেখিলাম। তখনই আমার মনে হইল যে ঐ দিকে সাগু প্রণালীতে কোন পাহাড় পর্ব্বত নাই। আমি পুনরায় ঐ দিকে চাহিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম যে উহা এক বিশাল সমুদ্র তরঙ্গ আসিতেছে এবং তীর দেশে আসিয়া ফাটিয়া পড়িবে। তখন প্রাণ ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলাম। যদিও তখন আমার দৌড়াইবার বয়স নয়, তথাপি আমি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। কিছু সময়ের মধ্যে ঐ তরঙ্গ তীরে আসিয়া পড়ার ভীষণ শব্দ আমার কাণে পৌঁছিল; চাহিয়া দেখি রাশি রাশি গৃহ চূর্ণ করিয়া ঐ তরঙ্গ প্রবল বেগে আমার দিকে আসিতেছে। আমি পুনরায় দৌড়াইতে লাগিলাম। প্রাণের দায়ে দৌড়াইয়া নিকটস্থ এক উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে তরঙ্গটী তথায় আসিয়া পৌঁছিল। তখন ও ঢেউ টী এত উচ্চ যে তাহা দেখিয়া আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম। জল স্রোত আমাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তখন আমি একরূপ জ্ঞান হীন। হঠাৎ একটা কঠিন পদার্থের সহিত ধাক্কা লাগাতে আমার জ্ঞান হইল। আমি হাতের নিকটে যে শক্ত পদার্থ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা দৃঢ় রূপে ধারণ করিলাম। পরে দেখিতে পাইলাম, যে উহা একটী নারিকেল বৃক্ষ। প্রবল তরঙ্গাঘাত হইতে বহু নারিকেল বৃক্ষের মধ্যে আমার জীবন রক্ষা করিবার জন্যই যেন এইটী রক্ষা পাইয়াছিল। ইতি মধ্যে তরঙ্গটী আমাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। ক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া তরঙ্গটীর বেগ কমিল এবং বারি রাশি সমুদ্রের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমি সেই ভীষণ দৃশ্য এ জীবনে ভুলিব না। আমি যখন সিক্ত ক্লান্ত অবস্থায় বৃক্ষটী আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, তখন দেখি আমার আত্মীয় বন্ধুদের বহু মৃত দেহ জলের সহিত ভাসিয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। গৃহ অট্টালিকা সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া সহরটী এক মৃতস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।"

এই অগ্ন্যোদ্‌গমে যে ধূলিকণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তাহা এতঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে উহাদ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সূর্য্যের উদয় ও অস্তের দৃশ্য এক অভিনব সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

ক্রেকেটোয়ার অগ্ন্যোদ্‌গম যদিও পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তথাপি ১৯০২ সনে মণ্ট পিলির অগ্ন্যোদ্‌গমে যে রূপ লোক ক্ষয় হইয়াছিল, ইহাতে তত হয় নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের মার্টিনিক দ্বীপে মণ্টপলি অবস্থিত। এই দ্বীপটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে একটী স্বর্গ দ্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০২ সালের পূর্ব্ব হইতে এই দ্বীপে বিপদের সূচনা হয়। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে পর্ব্বত হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে এবং ২৫শে এপ্রিল কিঞ্চিৎ ভস্ম উদ্গত হয়। কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একদল লোক গিয়া দেখে যে, তথায় এক পুরাতন শুষ্ক হ্রদ জল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৩০ শে সামান্য ভূমিকম্প ও বিদারণ হয়। কিন্তু এই সকল বিপদের সঙ্কেতেও লোকের মনে কোন রূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই। এমনকি তথাকার প্রধান সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় যে ৪ ঠা মে তারিখে একদল

বিধু বলিলেন—"ঠিক্ বলেচেন। ইউ আর কোয়াইট রাইট—ঠিক্ বলেচেন। তিনি দুটী ছেলেকে খরচ দিয়ে বিলেত পাঠিয়ে মানুষ করে এনে, বুঝলেন, তাদের হাতেই তার মেয়ে দুটীকে যে দেবেন, এই হচ্চে তাঁর ইচ্ছে।" বিধু চুপিচুপি শেষ কথা কয়টী বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"বটে, আপনি তাহা হইলে দুর্গাদাস বাবুর জামাই হবার কেণ্ডিডেট।" বলিয়া নগেন্ও উচ্চ হাস্ত করিল।

বিধু—"ঠিক ধরেচেন কিন্তু; আপনি সেই টে করে দিন। জীবন টাকে নন্দিত করে আনন্দের—তাঁর রাতুল চরণের পানে ধাবিত করবার উপায় করে দিন।"

নগেন—"থামুন না,! দুর্গাদাস বাবু দুইজন কে পাঠাইবেন? আর এক জন কে?"

"যতীন্ ভোস—ঐ যে ছোক্‌রা, নেহাৎ অরসিক, বৈজ্ঞানিক, আমাদের সঙ্গে চা খায়—সোনার চসমা—ওঁদের ছেলেদের প্রাইভেট টিউটার—।"

যতীন তো এম্, এস সি, খুব তুখার ছেলে, Presidencyতে রিছার্স স্কলার ছিল, ওকে তো দেওয়া উচিতই। আপনাকে দুর্গাদাস বাবু দিবেন কেন? সাহিত্যিক বলিয়া কি?

"ওর নিকট দিন না, ওতে আমার একেবারেই আপত্তির কারন নেই কিন্তু দেখুন, বোধ হয় ও হচ্চে না। ওকে মেয়েরা মোটেই পছন্দ করে না। বিদ্বান হ'লে কি হয় দাদা? ও চিন্তা করে, কিসে কোল্ কয়লার ধোঁয়ার প্রভাব হ'তে করোগেটেট আয়রনকে রক্ষা করা যেতে পারে? কলের চিমনি কি হ'লে ধুম ছড়াতে না পারে। ওর ভেতর কি রসের চাষ আছে? না প্রেমের বীজ আছে? রসহীন বিদ্বেটা যে বন্ধ্যা নারীর মত নিস্ফলা। যাক, তিনিতো এক জনকেই নেবেন, আমি আর এক জনের জন্য কেণ্ডিডেট।" বলিয়া বিধু খুব হাস্ত করিলেন।

নগেন গম্ভীর ভাবে বলিল—'ব্রাহ্ম সমাজে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। এত উপযুক্ত লোক থাকিতে দুর্গাদাস বাবু আপনার নিকট মেয়ে বিবাহ দিবেন?"

বিধু রাগ দেখাইয়া বলিল—"ভুল আপনার, ব্রাহ্মসমাজে উপযুক্ত আছে—এ জ্ঞান আপনাদের এক দম Quite [illegible] আর—ছেলে [illegible]

নেই। গড়ে এখন গ্রেজুয়েটের সংখ্যা বোধ হয় ছেলে অপেক্ষা মেয়েই বেশী হচ্ছে।

"আপনার এরূপ মন্তব্যের কারণ কি?" বলিয়া নগেন হাসিয়া বিধু বাবুর মুখের দিকে চাহিল।

"জানেন—তার এক মাত্র কারণ ব্রাহ্ম সমাজ তার সম্পূর্ণ এনার্জি ঐ স্ত্রীশিক্ষার ভেতর প্রয়োগ করেছেন। সমাজে যান—কেবলি শুন্‌বেন স্ত্রীশিক্ষা! স্ত্রী শিক্ষা! ছেলে শিক্ষার দিকে এটেন্‌সন্ ওদের একেবারে নেই বলিতে, কিছুই নেই। ফলে, ছেলে গুলো হচ্চে সব বাজে মার্কার। একি আপনারা দেখচেন না?"

নগেন একটু ধীরে ধীরে বলিল—"দেখিতেছি বটে, কিন্তু দুর্গাদাস বাবু যে যারতার হাতেই মেয়ে তুলিয়া দিবেন, তাও কিন্তু আমার মনে হয় না।"

বিধু হটাৎ রাগ করিয়া বলিল—"তবে তিনি কাকে দেবেন? কে তাঁর মেয়েকে বে কর্‌বে?

নগেন্ "কেন, ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁর মেয়েকে কে না আদর করিয়া নিবে?"

বিধু—"তবে আপনি ব্রাহ্ম সমাজের কিছুই জানেন না, কি—ছুই—জানেন না. বলে দিলাম—ভারি aristocratic feeling ও সমাজে কিন্তু; যাক, ও বিষয়ে আপনার চিন্তা নিস্প্রয়োজন।"

নগেন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "aristocratic feeling টার মানে বুঝিতে আমার গোল হইতেছে আপনাদের ভিতর কি জাতি ভেদ আছে?"

বিধু হাসিয়া বলিল—"খুব খু-ব। কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ কি দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে বে কর্‌বে? কখনই নয়! ব্রাহ্ম সমাজকে আপ্‌নারা বের থেকে দেখ্‌চেন।"

"দুর্গাদাস বাবু কি জাতি, আপনিই বা কি? আমরাতো ভাবিতাম, ব্রাহ্ম সমাজে সকলি এক।"

বিধু হাসিয়া বলিল—"দুর্গাদাস বাবু শুদ্র, তাঁহার ব্রাহ্মণ; আমি নমঃব্রাহ্মণ। আমাকে তিনি পেলে বাপঠাকুর বলে লুফিয়ে নেবেন।" বলিয়া বিধু খুব গর্বের সহিত নগেনের মুখের [illegible] [illegible]

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের একশত ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমরা মহর্ষি কামন্দকের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তথায় আঙ্গরিষ্ঠ ও মহর্ষি কামন্দক ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। এই মহর্ষি কামন্দক যে আমাদের অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কামন্দক নহেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কারণ তাহা হইলে আমরা মহাভারতের বর্ত্তমান অবস্থার রচনা কাল খৃষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীতে ফেলিতে বাধ্য হইব ; কিন্তু তাহা অসম্ভব ও প্রমাণ বিরুদ্ধ। অধিকন্তু অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা কামন্দকের অদ্ভুত মতাবলীর সহিত মহাভারতের মহর্ষি কামন্দকের মতাবলীর কোনও সাদৃশ্য নাই।

কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সর্গই শ্লোকবদ্ধ ছন্দে লিখিত ; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা শ্লোকে লিখিত হইলেও ইহাতে কবিত্ব—মাধুর্য্য খুব অল্পই অনুভূত হয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্লোকগুলিতে গাম্ভীর্য্য এবং সংক্ষিপ্তভাবে ভাব প্রকাশের চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সর্গে রাজা ও রাজন্যবর্গের প্রতি উপদেশ এবং ইন্দ্রিয় বিজয় ইত্যাদি বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে বিদ্যাবিভাগ, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এবং দণ্ড মাহাত্ম্য, তৃতীয় সর্গে রাজাপ্রজা সম্বন্ধে এবং সুবিচার ও অবিচারের ফলাফল, চতুর্থ সর্গে স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোষ, জনপদ এবং মিত্র ও রাষ্ট্র—রাজ্যের এই সপ্তাঙ্গ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে স্বামী এবং অনুজীবীবর্গ সম্বন্ধে এবং ষষ্ঠ সর্গে রাজ্যের কণ্টক শোধন ব্যবস্থা নিহিত আছে। সপ্তম সর্গে পুত্র ও অমাত্যাদি রক্ষণ, বিষ প্রয়োগাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, এবং অষ্টম সর্গে মণ্ডল গঠন বিষয়ে ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অষ্টম সর্গটি অত্যন্ত জটিল হইলেও রাজনীতি হিসাবে অত্যন্ত আবশ্যক। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এই মণ্ডল পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে কামন্দকও তাঁহার গুরুর অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসারে এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইহার কারণ মনে হয় যে রাজ্য সংস্থাপনের প্রথমাবস্থায় মণ্ডল-গঠনের প্রয়োজন থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে যখন সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তখন মণ্ডল প্রক্রিয়ার যুক্তিতর্কের অবতারণা ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে উহার আবশ্যকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে সন্ধি, বিগ্রহ, মন্ত্রণা ও দূত প্রচার সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গে রাজব্যসনাদি এবং তাহার প্রতিকার, চতুর্দ্দশ সর্গে সপ্ত-ব্যসনাদি এবং পঞ্চদশ সর্গে যাত্রাভিযোগ দর্শন বিষয়ে বিবৃত আছে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতি সর্গে সৈন্যসজ্জা, যুদ্ধ প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা আছে।

শুক্রনীতিসার গ্রন্থে যেমন সমাজ নীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে এই গ্রন্থে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই কামন্দক নীতিসার গ্রন্থের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রভৃতি সর্গ নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত বিগর্হিত ও কূটভাবাপন্ন। এই সম্বন্ধে পাঠকগণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ নিজ মতাবলম্বন করিতে পারেন, তবে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে যেখানে কূটরাজ নীতির আশ্রয় লইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল কূটনীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ; নতুবা সাধারণতঃ দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থের প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে উচ্চ আদর্শের নৈতিক শিক্ষার ও নৈতিক পথা-বলম্বনের জন্য নিয়মাবলী সন্নিহিত আছে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তিকেই সেই সর্গের আলোচ্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে। কৌটিল্য ও কামন্দকের উভয় গ্রন্থের মধ্যে কামন্দক যে যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহারই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আমরা প্রথমতঃ যদিও দেখিতে পাই যে কামন্দক তাঁহার নীতিসারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেরই সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি কার্য্যকালে দেখি "অর্থ শাস্ত্রের" পঞ্চদশ অধ্যায়ের মধ্যে "রাজ্যশাসন পরিদর্শন" "ব্যবহারনীতি" প্রভৃতি চারিটি অধ্যায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে যে গ্রন্থের আয়তনই কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত

মরি হায় রে,— * * থাকতে যে বালাখানায়,—
জল খাইতে মাখন ছানায়,—
এখন এই জেল খানায়, ডাইল খেয়ে প্রাণ যায়।
মিল,—তোমার উচিত শাস্তি দিয়াছে সাহেব,—
বানাইয়াছে রাম ছাগলের পাঁঠা,—
করে নারী চুরী বুকের পাটা বাড়ছে তোমার অতিশয়।
অন্তরা,- নবীন যে তেজীর ছেলে, নারীকে সাঙ্গ কৈলে —
তাতেই টের পাইলে শাস্তিরাম,—
লাভের মধ্যে এই করিলে, ধনপ্রাণ হারাইলে,
দেশ বিদেশেরাষ্ট্র কৈলে,—লুকন্দরা, নাম।
কৈ তোমার সিকাই সাজন,
কৈ তোমার,— অঙ্গের ভুষণ,—
মুখ খানি কাঁচ্ কলার মতন, দেখে বড় দুঃখ হয়।
মনে শুধু বলে, * * * ইচ্ছা হয়।

হারাইল বিশ্বাস মহাশয়ের রচিত যে কয়টি গীত লেখা হইল,—তন্মধ্যে এলোকেশীর রূপ বর্ণনার স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বের ঝঙ্কার পরিস্ফুট হইয়াছে। " —— কন্যা এলোকেশী, ষোড়শী রূপসী, দেখে তার বদন শশী, উর্ব্বসী পলায়।" কিসুন্দর!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

শক্তি পূজা।

বিশ্ব সংসারে সর্ব্বদাই যেন এক সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফলে প্রবল দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করিয়া নিজের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখিতেছে। এই জন্যই দুর্ব্বল প্রবলকে ভয় করে, প্রজা রাজাকে ভয় করে। মূর্খ জ্ঞানীকে ভয় করে, গরীব ধনীকে ভয় করে। কারণ ধনী, জ্ঞানী, রাজা সকলেই শক্তিমান। যখন দুই রাজায় সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন ধন বল, জন বল, জ্ঞান বল প্রভৃতি নানাবিধ বলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। অবশেষে ইহাদের সমবায়ে যাহার বল অধিক হয়, সেই জয় লাভ করিয়া থাকে। বল কিম্বা শক্তি বুঝিতে হইলেই আমাদিগকে এক মল্ল যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ পক্ষে শারীরিক মল্ল যাহা দেখিতে পাই, স্থুল ভাবে বলিতে গেলে উহাই শক্তির সরল অভিব্যক্তি।

আমরা বিশাল অট্টালিকা, সুদৃঢ় দুর্গ, প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া অনেক সময়ে সসম্ভ্রমে উহাদের দিকে তাকাইয়া থাকি, উহাদিগকে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু কিম্বা বজ্রপাতে বিচূর্ণিত হইতে দেখিলে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কারণ আমরা যাহাদিগকে মহাশক্তিশালী বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও প্রবলতর শক্তির ক্রিয়া এখানে দেখিতে পাইলাম।

উন্নত গিরিশৃঙ্গ কিম্বা বিশাল বারিধি—যাহা দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা যখন আগ্নেয়গিরির ভীষণ উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবল ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনরূপ নৈসর্গিক কারণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আমরা ঐ শক্তিকে মনেং পূজা না করিয়া পারি না।

যখন জাহাজে চড়িয়া নদী পথে গমন করি, তখন নদীবক্ষে ভাসমান তরণী সকল দেখিয়া জাহাজের তুলনায় উহাদিগকে কত ক্ষুদ্রই না মনে হয়। আবার যখন ঝঞ্ঝাবাতে সেই বৃহৎ জাহাজকে আন্দোলিত করিয়া জলে মগ্ন করিয়া থাকে তখন ঝড়ের শক্তির নিকট জাহাজ যে কত তুচ্ছ তাহা বুঝিতে পারি।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে সুদৃঢ় অট্টালিকায় বসিয়া নিকটস্থ কুটীর কিম্বা বৃক্ষরাজ বিকম্পিত হইতে দেখিলে মনে হয় আমরা প্রবল শক্তিশালী অট্টালিকার আশ্রয়ে কিরূপ নিরাপদে রহিয়াছি। কিন্তু যখন ঐ অট্টালিকাটী একটী কামানের গোলায় ভূমিসাৎ হইতে দেখি, তখনই উপলব্ধি হইয়া থাকে আমাদের কামানের শক্তির নিকট অট্টালিকার শক্তি কত নগণ্য।

শিশুকালে আমাদের গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়কে বড়ই পরাক্রমশালী মনে হইত, কিন্তু স্কুল পরিদর্শনের জন্য সব-ইন্সপেক্টার বাবু আসিতেছেন শুনিলে পণ্ডিত মহাশয়ের তেজও হীন প্রভ হইয়া পড়িত। প্রবল শক্তির সম্মুখে দুর্ব্বল শক্তি সর্ব্বদাই এইরূপ মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

এখন আমরা রাজশক্তি কি? সে সম্বন্ধে একটু

কার্ব্বনাদি অম্ল বাষ্প ও অন্যান্য দোষিত বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বিষাক্ত বাষ্পে অনেক বালকের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকায় বালকের পরিবর্ত্তে কুম্ভীরের দ্বারা ঐ কার্য্য সংসাধিত হয়। কুম্ভীর শীকার জন্য বেতন করা শীকারী আমেরিকার পূর্ত্ত বিভাগে নিযুক্ত আছে। তাহারা কুম্ভীর ধরিয়া জলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত কুম্ভীরকে নর্দ্দমা মধ্যে ছাড়িয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে নলদ্বারা নর্দ্দমায় প্রচুর পরিমাণে জল দিতে থাকে। কুম্ভীর নর্দ্দমার কর্দ্দম বহন করিয়া লইয়া যায়।

মোটর বাঁশী।

জাপানের কিউটো পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্যালয়ে ১২টার সময়ে তোপ দাগিবার পরিবর্ত্তে মোটরের বাঁশী ব্যবহার করা হয়। উহা ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও পিতল নির্ম্মিত। উহাই জগতে দীর্ঘতম বাঁশী। উহা কোয়াসকি বন্দরের কারখানায় প্রস্তুত। বাঁশীটি কিউটো নাগরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত। দ্বাদশ ঘোটকের শক্তি বিশিষ্ট একটি বৈদ্যুতিক মোটার দ্বারা পরিচালিত হয়। কার্য্যালয় হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সাহায্যে ১২ টার সময়ে সঙ্কেত করা হইলেই পাইপ দ্বারা ঐ বাঁশীর মধ্যে বায়ু চালিত করা হয়; তখন শত বজ্র পতনের ন্যায় শব্দশুনা যায়।

মধুমক্ষীর দৌত্য।

যুদ্ধে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য পূর্ব্বে অনেক স্থানে পারাবতের ব্যবহার ছিল। এখন পারাবতের পরিবর্ত্তে মধুমক্ষিকার দ্বারা ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মধুমক্ষিকাকে মধুচক্রের মধ্যে রাখিয়া লালিত পালিত করে। এবং যেখানে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে তথায় ঐ মধু চক্রের কিয়দংশ ও উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প রাখা হয়। মধুমক্ষিকার পক্ষে অণুবীক্ষণিক যন্ত্র সাহায্যে সাঙ্কেতিক সংবাদ লিখিয়া মক্ষিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মক্ষিকা সেই স্থানে গেলে অনুবীক্ষণ সাহায্যে সংবাদ পাঠ করা হইয়া থাকে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

মিলনের ব্যথা।

দূরেতে রহিলে হিয়া মাগে দরশন;
মিলনে চাহিয়া থাকি, নাহি মিটে সাধ।
সহসা বিরহ নিয়ে দুঃখ-শিহরণ
প্রণয়ের তটে তটে গাঁথে শিলা বাঁধ।
প্রাণ ত হয়নি খোলা তৃষা অগ্নি-গিরি।
পুড়িছে অন্তর নিত্য অনল উগারি।

শ্রীদীননাথ মজুমদার, এম্, এ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও করতোয়া—শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু প্রণীত, মূল্য একটাকা। গ্রন্থ খানা পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এবং করতোয়া—এই দুইটি অংশে বিভক্ত এবং এক এক অংশে চারিটী করিয়া অধ্যায়। পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের আদি কথা ও অবস্থান, পৌণ্ড্র দেশের বিবরণ, ধর্ম্মেতিহাস ও ঐশ্বর্য্যাদি এবং পৌণ্ড্র বর্দ্ধন বা মহাস্থানের আধুনিক অবস্থার ইতিহাস—প্রথম অংশে, এবং করতোয়ার প্রাচীনত্ব ও গঙ্গার সহিত করতোয়ার সম্বন্ধ, পুরাণে করতোয়া, করতোয়া মাহাত্ম্য, করতোয়ার গতি, বাণিজ্য, করতোয়ার ক্ষুদ্রত্বের কারণ, অধুনা করতোয়া ও দেশের অবস্থা—দ্বিতীয় অংশে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার শাস্ত্র গ্রন্থাদি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুসন্ধানের প্রসংশা করিতেছি। এইরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হইবে, ততই সাহিত্যের সম্পদ ও দেশের গৌরব বৃদ্ধির কারণ হইবে।

সাবিত্রী—শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী প্রণীত, মূল্য একটাকা। কবি-গ্রন্থকর্ত্রীর রুক্মিণী পড়িয়া একদিন যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সাবিত্রী পড়িয়াও আজ সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছি। পাঁচটী সর্গে এই কাব্যগ্রন্থ রচিত, পাঁচটী সর্গই কাব্য মাধুর্য্যে ও লিপি কৌশলে অলঙ্কৃত। ছাপা, কাগজ, বাঁধাইও সুন্দর।

কাব্যের শিক্ষা।

কেহ কেহ হয়ত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে পারেন, কাব্যের আবার শিক্ষা কি? কারণ, কয়েক বৎসর হয় আমাদের সাহিত্যিক মহলে দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচক শ্রেণী দেখা যাইতেছে। একদলকে একান্ত সৌন্দর্য্যবাদী এবং অপরদলকে অতি-নীতিবাদী সমালোচক বলা যাইতে পারে। এক পক্ষের মত—সুকুমার সাহিত্যের একমাত্র কার্য্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও তদ্দ্বারা পাঠকের আনন্দবিধান, অপর পক্ষের মতে, কাব্যকারের একমাত্র কর্ত্তব্য শিক্ষাদান। একপক্ষ বলেন—কাব্য শুধু শিল্পচাতুরি, অপর পক্ষের মতে তাহা নিরেট্ গুরুগিরি। এই সাহিত্যিক দ্বন্দ্বটা আমাদের দেশে নূতন আমদানি হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা তত নূতন নহে। রবার্ট ব্রাউনিংএর The Ring and the Book নামক কাব্য প্রকাশিত হইবার পর ইংরাজ সাহিত্যিক সমাজে এই প্রশ্নটাই উঠিয়াছিল। অতি-নীতিবাদীর দল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যেহেতু উক্ত কাব্য পাঠক সমাজের জন্য দৃষ্টতঃ কোন শিক্ষা বহন করিয়া আনে নাই, অতএব তাহা কাব্য নামবাচ্য নহে। মোট কথা একপক্ষ ভুলিয়া যান যে কাব্য-রচনা একটা Art বা ললিতকলা,—অন্য পক্ষ মনে রাখেন না যে প্রকৃত আর্ট, বিলাসবাসনার, ইন্দ্রিয়সেবার যন্ত্রস্বরূপ নহে, পক্ষান্তরে তাহা মানব সভ্যতা ও সাধনার এক শ্রেষ্ঠ উপাদান,—মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের নিদান। কাব্যের বা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অব্যবহিত উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টিদ্বারা আনন্দ বিধান বটে, কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলেই আরেকটা গূঢ়তর অভিসন্ধি নিহিত থাকে, যদিও ঐ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা উক্ত অভিসন্ধির অস্তিত্ব বিষয়ে দর্শক বা শ্রোতাকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিয়া তাহার রসসম্ভোগের ব্যাঘাত জন্মান না। সুবিখ্যাত রসজ্ঞেরা কাব্য সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের এই মীমাংসায়ই উপনীত হই।

গ্রীক্ মনীষী Aristotle ইতিহাস অপেক্ষা কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন উপলক্ষে কাব্যান্তর্গত যে 'Higher Truth', 'Higher Seriousness'এর কথা বলিয়াছেন তাহাই শ্রেষ্ঠকাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য। আপাতচঞ্চল মানবজীবনের অন্তরতম ধ্রুব সত্যের সন্ধান—মানুষের জন্ম মৃত্যু-কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যকার গূঢ় রহস্যটির সুসঙ্গত সমাধান প্রকৃত কাব্যই আমাদের চিত্তফলকে অনায়াসে মুদ্রিত করিয়া দেয়।

কবি শেলীর মতে—Poetry is what redeems from decay the visitations of the divinity in man, and is the record of the best and happiest moments of the best and happiest minds—যাহা মানব-হৃদয়ের দৈব প্রেরণাগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সঞ্জীবিত রাখে তাহাই কবিতা। সানন্দচিত্ত, নির্দ্বন্দ্ব, মনীষাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবরাশির লিপিবদ্ধ ইতিহাসই কাব্য। ফরাসী ভাবুক Amiel বলেন—The true poetry is that which raises you towards Heaven, and fills you with divine emotions, which sings of love and death, of hope and sacrifice, and awakens the sense of the infinite.—প্রকৃত কাব্য মানুষকে স্বর্গের অভিমুখে উন্নীত করে, মনুষ্য হৃদয়কে পবিত্র ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত করে; প্রকৃত কবিতা প্রেম, মৃত্যু-আশা ও আত্মত্যাগের সুমহান্ সঙ্গীত, তাহা আমাদের অন্তরে অনন্তের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। মার্কিন দেশীয় কবিদার্শনিক এমার্শন "Poetry and Imagination" (কবিতা ও কবি-কল্পনা) নামক প্রবন্ধে বলেন:—

Poetry is faith···must be affirmative. It is the piety of the intellect. "Thus saith the Lord," should begin the song. The poet who shall use nature as his hieroglyphic must have an adequate message to convey thereby. He is the true Orpheus who writes his ode, not in syllables, but in man. * * The poet must let humanity sit with the muse in his head... should rejoice if he has taught us to despise his song; if he has so moved us as to lift us—

সামাজিক দলাদলি যখন চরমে উঠিয়াছিল, তখন পীরপুরের অসংখ্য অনাবশ্যক মোকদ্দমা আদালতে গড়ায়। তারাপদ সান্যালও সেই সময় তাঁহার রেহেনী খতের নালিশ করেন। ইচ্ছা করিলে সান্যাল আরও পাঁচ ছয় বৎসর অপেক্ষা করিতে পারিতেন; তিনি তাহা করেন নাই। তারপর যখন সান্যাল বাড়ীর দুর্ঘটনার মূল বলিয়া সকলেই তারাচরণকে সন্দেহ করিল, তখন তারাপদ তাঁহাকে গৃহহীন পথের ভিখারী করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছে। দাবী আদালত খরচ সহ প্রায় পাঁচ হাজারে উঠিয়াছে। সুতরাং দরদার তাহার পক্ষে অসাধ্য—ভরসা এক মাত্র পুত্র; সেও যদি অবাধ্য হয় তবে সান্যালদের প্রতিজ্ঞা ফলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

তারাচরণ গ্রীষ্মের বন্ধে পুত্রকে বাড়ী আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া লিখায় 'জন্মোৎসব' শেষ করিয়া নগেন বাড়ী আসিয়াছে।

প্রথম দিন তারাচরণ ঋণ সম্বন্ধে পুত্রের নিকট কোন কথাই তুলেন নাই। পরদিন প্রাতে তিনি নগেনকে জানাইলেন—

"সান্যালের ডিক্রির একটা হেস্তনেস্ত না করিলে আর চলে না; লোকটা কেবল হুজুগে মাতিয়া নালিশ টা করিয়াছে—সময় ছিল তার আরও ছয় বৎসর।"

নগেন কোন কথা বলিল না। চৌকীর কোণে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

তারাচরণ—"এ সম্বন্ধে পরামর্শ কি? ডিক্রির টাকাটা এখন আদালতে দাখিল করিয়া দিতে পারিলেই মুখ থাকে।"

নগেন—"আমি এ সম্বন্ধে কি বলিব? আমার যোগ্যতা তো দেখিয়াছেন। দুটী বৎসর বসিয়া থাকিয়াও একটা ২৫৲ টাকার চাকুরী পাইলাম না। আমি এখন এই সমস্যার কি করিতে পারি?"

তারাচরণ—"এখন তো তুমিই করিবে—উপযুক্ত পুত্র তুমি। চুরী কর, চামারী কর, যেরূপ করিয়াই হউক, ঋণও দিতে হইবে, পরিবারও প্রতিপালন করিতে হইবে। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে কি আর চিন্তার অন্ত আছে?"

নগেন—"আমাকে কি করিতে বলেন? এ সম্বন্ধে আমার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন পন্থা নির্দ্দেশ করিলে সে সম্বন্ধে ভাল মন্দ আলোচনা করা যায়।"

তারাচরণ বলিলেন—"ঋণ তো শোধ করিতে হইবে?"

নগেন বলিল—"না শোধ করিলে কি হইবে?"

তারাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"পাগল, এ ঋণ শোধ না করিলে, মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না। এ যে বাস্তুভিটা লইয়া গেল।"

নগেন বলিল—"সে তো ঠিক কিন্তু ঐ বাস্তুভিটা কি পাঁচ হাজারেরই উপযুক্ত! তুলনা করিলে কোনটা গুরুতর—পাঁচ হাজার টাকা, না ওই জমি-বাড়ী? অবশ্য যদি জমি বাড়ীই অধিক মূল্যবান হয়, তবে এই জমি বন্ধক দিয়া অনায়াসেই অন্য কোন স্থান হইতে পাঁচ হাজার টাকা আনিয়া এ ঋণ শোধ করা যাইতে পারে।"

তারাচরণ—"সেটাই তুমি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। এই পৈত্রিক ভিটা বাড়ী গেলে, স্ত্রী পুত্র পরিজন লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, কাহাকে বলিব, একটু স্থান দাও—কেই বা সেরূপ স্থান দিবে।"

নগেন বলিল—"জয়নগরের বাড়ীতো খালি পড়িয়াই আছে; যদি পাঁচ হাজার টাকা এ বাড়ী-জমির মূল্য যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে তাহা আপাততঃ বরং ছাড়িয়া দেন। পাঁচ হাজারের উপর বাড়ী জমি বিক্রয় হইয়া যাউক। আমরা গিয়া জয়নগরেই বাস করিতে থাকি।"

তারাচরণ বলিলেন—"পৈত্রিক বাড়ী নিলামে তুলিয়া শেষ বয়সে শ্বশুর বাড়ীতে থাকিব?"

নগেন—"ঋণ করিলে তো ঋণ দিতে হইবে? এখন পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া যদি জমি বাড়ী রাখেন শোধ দিবার উপায় কি? আর ছয় বৎসরে যে তাহা ৮ হাজার হইবে, বার বৎসরে ১০ হাজার হইবে।

নগেন—"না দাদা, উকিল হইব কি, এখনও পড়াই শেষ হয় নাই। দুটা বৎসর মাঝে কামাই গিয়াছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিল—"চলুন অগ্রসর হই, গমনোদ্যমই তো দেখিতেছি।"

নগেন ইতস্তত করিয়া বলিল—"এক স্থানে যাইবার কথাছিল—।" একটী ভদ্র লোক অপেক্ষা করিবেন।"

ভট্টাচার্য্য—"কোথায় যাইবেন,—কেই বা অপেক্ষা করিবেন?"

নগেন—"যোগ জীবন ব্রহ্মচারীর নিকট যাইতে ইচ্ছা ছিল।—"

ভট্টাচার্য্য—"চলুন না—সে তো দুর্গাবাড়ীর নিকট—অসিঘাট।"

নগেন—"তাঁহার সহিত আপনার আলাপ আছে কি?"

ভট্টাচার্য্য—"আমরা দুই তিন দিন গিয়াছি। তিনি খুব আলাপি লোক। লোকের সকল কথারই উত্তর দেন। নানা রকম প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। লোকটা চার শতাব্দীর প্রাচীন, বহু গুণে গুণবন্ত!

নগেন—"সে তো শুনিতেছি, এত দিন কি লোক বাঁচিতে পারে?"

ভট্টাচার্য্য—"সে সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত আলাপ ছিল, অবশ্য আমার নয়—কাশীর প্রায় সকল বড় লোকই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন—তাঁহাদের সহিত আলাপে ব্রহ্মচারী বাবাই বলিয়াছেন—মানুষের অসংখ্য বৎসর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নহে। তবে মাঝে মাঝে দেহের জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়। মহাত্মাও ৬ বার দেহের জীর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন, ৪র্থ সংস্কারে তাহার বয়স ৪৩ হইয়াছে। শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া গেলেও মাথার চুল বা দাড়ি একটীও পাকে নাই—আশ্চর্য্য!"

নগেন, ভট্টাচার্য্যের সহিত অসি ঘাটে যাইয়া যোগ-জীবন ব্রহ্মচারীর পদধূলি লইয়া আসিল।

ব্রহ্মচারীর সহিত সেদিন তাহার বিশেষ কোন আলাপ হইল না। লোকের গতি বিধি ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াই নগেন সে দিন চলিয়া আসিল। ভট্টাচার্য, তাহাকে পুনরায় তাহার বাসায় আনিয়া পঁহুছাইয়া দিয়া গেলেন।

নগেন বাসায় আসিয়া বৃদ্ধাকে আশ্রম দর্শনের কথা বলিলে বৃদ্ধাও সাধু দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেন শেষ পরীক্ষা দিয়া পিতার আদেশে বাড়ীতে আসিয়াছে। দেশের খবর আর কাহারও নিকট না জিজ্ঞাসা করিয়া সে তাহার বৌদিদির নিকট শুনিতে বসিল। শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল "সান্যালদের বাড়ীর ঘটনাটা কিরূপে হইল, তারপর আর একেবারেই সাড়াশব্দ নাই! এর ভিতরের রহস্যটা কি বৌদি?"

বৌদি বলিলেন "সেই যে দিন ইস্কুল ঘরে সভা হইল—সভার পরে সান্যাল বাবু আমাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রস্তাব তুলিয়া গেলেন। রাত্রে হিতসাধিণীর বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আহার করিয়াছিলেন; খাওয়া দাওয়ায় রাত অনেকটা হইয়াছিল। আমরা সবে চক্ষু বুজিয়াছি, তার একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের ভয় হইতে লাগিল; ঠাকুরকে কোথাও যাইতে দিলাম না। তিনি অতুলকে দৌড়াইয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া খবর দিল। তখন ঠাকুর আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি লোকজন ডাকিয়া—লইয়া গেলেন। রাত্রি ভরিয়া অনুসন্ধান হইল, কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাতঃকালেই মহকুমায় যাইয়া পুলিস সাহেবকে লইয়া আসিলেন। আহা মেয়েটার জাতি ও গেল—।" বলিয়া বৌদিদি কাঁদিতে লাগিলেন।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করিল—"এরূপ হইল কেন? করিলই বা কারা? তার কিংকিছু জানা গেল না?"

বউদি চখের জল মুছিয়া বলিলেন—"ঐ দিনের সভায় সান্যাল বাবু নাকি ও পাড়ার মুখুজ্জা মহাশয়ের ও চক্রবর্ত্তী দিগের কুল-কর্ম্মের কলঙ্ক কথা বলিয়াদিয়াছিলেন, তাই ওরাও তাহার কুলে কলঙ্ক দিল। শুনিতেছি আপনার মুখুজ্জা খুড়াই লোকজন দিয়া এই কলঙ্কের কার্য্য করিয়াছিলেন।"

নিজ বল বুদ্ধিকে প্রবল বলিয়া কখনও গণ্য করিও না। ইহাই যুবক জীবনের প্রকৃত পন্থা।"

নগেন—তবে আসি; আজই কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

ব্রহ্মচারী—"তবু যাইব! যাইবার তুমি কে? তোমার যাওয়া ভগবানের ইচ্ছা নহে।"

নগেনের নিকট ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তা প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। সে বিনীত ভাবে বলিল—"তবে কি কর্ত্তব্য?"

ব্রহ্মচারী—"আজ যাও।"

নগেন ধীরে ধীরে বলিল "তবে কি আমার আজ কলিকাতা যাওয়া হইবে না?"

ব্রহ্মচারী—"ভগবান যদি নেন, তবেতো যাইবেই—নতুবা কাল দেখা হইবে।"

নগেনের উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কি জানি কি হয়! অথচ কথা গুলি তাহার নিকট নিতান্তই যেন বাজে কথা—ঠাট্টা তামসার মত বোধ হইতে ছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—ব্রহ্মচারী এত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া আমার সঙ্গে বাচালতা করিয়া তাহার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবেন? নগেন পুনরায় পদধূলী লইয়া বলিল—"তবে কাল পুনরায় আসিব।"

ব্রহ্মচারী রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"যাও!"

দুর্গাদাস বাবু গাড়ীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলেন; নগেন যাইয়া বলিল—"ব্রহ্মচারীকে বুঝিলাম না; আমার যাওয়া আজ হইবে না।"

দুর্গাদাস বাবুর নিকট সে সংক্ষেপে ব্রহ্মচারির উক্তি বিবৃত করিল। দুর্গাদাস বলিলেন—"চল বাসায় তো যাই।"

দুর্গাবাড়ীতে গাড়ী থামাইয়া নগেন মহেশকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল—"আজ চলিয়া যাইবার কথা, আমি চলিয়া গেলাম কি না কাল প্রাতে একবার আমাদের দশাশ্বমেধ ঘাটে ও বাঙ্গালী টোলার বাড়ীতে আমার তত্ত্ব লইও।"

মহেশ বাহির হইতেছিল, তাহার সঙ্গ লইল এবং কিছু দূরে আসিয়া নামিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর নগেনের শরীরের বেদনা বৃদ্ধি হইল। সে দুর্গাদাস বাবুকে বলিল, আপনারা আজই চলিয়া যান—আমি মনের ধাঁধা না ভাঙ্গিয়া আসিব না; কাল আর একবার ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাঁর যেমন টা খুসি করিয়া যাইব; তাঁহার কথায় মনটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

নগেন বেদনা অগ্রাহ্য করিয়াই সকলকে লইয়া ষ্টেসনে গেল। ও তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। আশা, তাতা, বকুল, নগেন কে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল। তাতাকে চুমা দিয়া, আশার গালে ধীরে ধীরে টোকা মারিয়া, বকুলের করমর্দ্দন করিয়া নগেন আদর প্রকাশ করিল। পারুল ঢিপ করিয়া নগেনের পায়ে প্রণাম করিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। নগেন সকলকে উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইল।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন—"কাল চলিয়া যাইও।" গাড়ী চলিতে লাগিল। পারুল—রুমাল উড়াইয়া, ঘুরাইয়া নগেনকে বিদায় দিল, নগেনও রুমাল ঘুরাইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল। বাসায় আসিবার পথেই নগেন, তাহার শরীরে এমন উৎকট বেদনা অনুভব করিতে লাগিল যে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিবারও তাহার তর সহিল না। সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিনেই পীরপুরের সম্যক অবস্থা শৈলেন্দ্র মন দর্পণে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সমস্যা সমাধান তাহার নিকট বিশেষ জটিল বলিয়া বোধ হইল না। খুব সহজ বলিয়াও মনে হইল না। পারিবারিক সমস্যা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলেই মীমাংসা হয়। সামাজিক সমস্যায় আত্মত্যাগ চাই। একটী নিজের স্বার্থকে পরিত্যাগ করা, আর একটী নিজেকেই তার জন্ত দেওয়া।

সমাজ সমস্যা মীমাংসার জন্ত শক্তিমান পুরুষের দরকার। যার ধনের গৌরবে, মানের গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বুদ্ধির গৌরবে—এক কথায় যার ব্যক্তিত্বের গৌরবে সমাজ উজ্জ্বল, এমন লোক চাই। এমন লোক হওয়া কি সহজ? সুতরাং সামাজিক সমস্যা সমাধান করা যাহার তাহার পক্ষে সহজ নয়।

গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে ইহার পরই ঘন বজ্রপাত আরম্ভ হইল। দারুণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। যে যাহাকে পাইল মারিয়া ফেলিল। শত্রু মিত্রের ঠিকানা রহিলনা। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা আসিয়া পঁহুছিল এবং মহারাণী উপর তালা হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন "আমার শত্রুদিগকে নির্ব্বংশ কর।" তখন মৃতদেহের স্তূপ পড়িয়া গেল। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে, মহারাণীর লোক প্রথমে গুলি চালাইলে পরে জনগণ উন্মত্ত হইয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটন করে। এই ব্যাপারের পরিণাম কি হইবে পূর্ব্বে কাহারো জানা ছিল না। ৩১ জন বড় সর্দ্দার বা উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী, ২০ জন মধ্যবিদ সর্দ্দার, বহুতর সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। একই সময়ে হঠাৎ এইরূপ ভাবে হত্যাকাণ্ড ভারতের স্বাধীন রাজ্য কেন—পৃথিবীর কোন যথেচ্ছাচারী স্বাধীন দেশেও ইতঃপূর্ব্বে আর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই অমানুষিক ব্যাপার ইতিহাসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। ভীরু স্ত্রৈণ মহারাজার অবিবেচনায় যে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহারাণী জঙ্গবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিয়াছিলেন। জঙ্গবাহাদুর মহারাণীকে তাঁহার হনুমান ঢোকা প্রাসাদে পঁহুছাইয়া দিয়া মহারাজের নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে অভিবাদন করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আমার রাজ্যের এতগুলি প্রধান ব্যক্তির হত্যা কে ও কেন করিয়াছে?" জঙ্গবাহাদুর বলিলেন "আপনিইত মহারাণীকে সর্ব্বক্ষমতা দিয়াছেন, যাহাকিছু তাঁহার হুকুমেই হইয়াছে।" মহারাজ তখনই মহারাণীর নিকট অন্দর মহলে গেলেন। মহারাণী ভূতলে লুণ্ঠিতাবস্থায় পড়িয়া কাঁদিতেছিলেন। রাজা ও রাণী উভয়ের মধ্যে বচসা হইল। রাণী কহিলেন "আমার বড় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিলে আরো নরহত্যা হইবে।" মহারাজ রাগ করিয়া পাটন নগরের দিকে অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। পথে টাণ্ডিখেলে ভবানী সিংহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। রাজার আরদালী—রাণীর গুপ্তচর এই সংবাদ রাণীকে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভবানী সিংহের মস্তকচ্ছেদ করার জন্য ৫০ জন সৈন্য পাঠাইলেন। রাজার সাক্ষাতেই ভবানী সিংহের শিরোচ্ছেদ হইল। রাজা আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। এই সময় জঙ্গবাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজকে গোপনে যাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। ইহার পরই হত সর্দ্দার দিগের সম্পত্তি মহারাণীর হুকুমে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। তাঁহাদের পরিবার বর্গ এক একটী পুটলী লইয়া দেশ ত্যাগী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর দুষ্ট বুদ্ধির এইখানেই শেষ হইল না। তিনি জঙ্গবাহাদুরের নিকট যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জঙ্গবাহাদুর এই অন্যায় প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। রাজবাটীতে এইরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পরই মহারাণীর আদেশে যুবরাজকে তাহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস বাটীতেই অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণীর এই দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য জঙ্গবাহাদুর তাঁহার নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহাদের প্রহরী করিয়া রাখেন এবং প্রত্যহ স্বয়ং গিয়া উঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। এই সময় মহারাণী ও জঙ্গবাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; কিন্তু সকল রাজকার্য্যই মহারাজাধিরাজ, যুবরাজ এবং মহারাণীর নামে পরিচালিত হইত। মহারাণী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, জঙ্গবাহাদুর তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অথচ এই বিষম হত্যাকাণ্ডের কার্য্যও নিষ্ফল হইল, তখন তিনি বীরধুজ বাশ্নিয়াৎ নামক একব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মহারাজাধিরাজ, যুবরাজ, জঙ্গবাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে রাজবাটীর এক স্থানে যাহাতে একত্র আনাইয়া সকলকেই একবারে নিহত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার, চিন্তা করিতেও অন্তর শিহরিয়া উঠে।

হত গগন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজির সিংহ পিতার মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়া এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বিজলী রাজ নামক এক পণ্ডিতও এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। পরে এই পণ্ডিতের বিশ্বাস

পড়িয়া দেখিও, উহাতে পুতুলের উপাসনা নাই—সেই চিন্ময়ী শক্তিরই উপাসনা আছে। আদ্যা শক্তির ষড়ৈশ্বর্য্যের স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যই মূর্ত্তির কল্পনা। উহা পুতুল পূজা নহে,—পুতুলের পূজা করিলে ধ্যান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইত না।

এমন সময় বিজলী আসিয়া ডাকিল "বেয়ারা"! সনাতন জড়সড় হইয়া উপস্থিত। বিজলী ভ্রূভঙ্গি করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল "আমার খাবার আনিস্‌নি কেন রে?

সনাতন—দিদিমণি, আমার বড় জ্বর হইয়াছে, তাই যাইতে পারি নাই।

বিজলী—খাবার সময় ত একথাল উ'ড়ে যায়; তখন ত জ্বর আসে না!

বৃদ্ধ নীরব—ব্রহ্মানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারা যায়, কাজ করান যায় না। তুমি বুদ্ধিমান উচ্চ শিক্ষিত, যাহা ভাল বুঝ করিও। তোমার সংসার হইতে এতকাল পরে মা আনন্দময়ীর অন্ন উঠিতেছে দেখিয়া এত কথা বলিলাম।"

অন্নপূর্ণা—ঠাকুর, আনন্দময়ীর অন্ন ওঠে, আমার অন্ন ওঠে না কেন?

গৃহিণী কুটীল নেত্রে শাশুড়ীর পানে তাকাইল।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর খাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁর অন্নের অভাব হইবে না। গুরুদেব, আপনি দুঃখ করিবেন না। এও বোধ হয় তাঁর একটা লীলা।

গুরু—দীর্ঘ জীবী হও। মার লীলা মা ই জানেন। আর দুই মাস্ পরইত দীপান্বিতা? দেখি মা কি করেন।

(২)

পরেশ মহকুমায় জমিদারী কাছারীর নায়েব। মহকুমায় অত্যন্ত কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পরেশ জন সাধারণের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করিয়া দিবা রাত্রি রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছে। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা পরেশ ও সেই দারুণ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। বান্ধব-হীন পরেশকে আর কে দেখিবে? সকলে পরামর্শ করিয়া পীড়িত পরেশকে তাহার উকিল দাদার বাসায় পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেখানে তাহার স্থান হইল না। সংক্রামক ব্যাধি--তাই বৌদিদি তাহাকে বাড়ীতে রাখা বিপদ জনক মনে করিয়া হসপিটালে পাঠাইয়া দিলেন। বিমল বাবু ডাক্তারদেরে বিশেষ রকম অনুরোধ করিয়া দিলেন, যেন পরেশের চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়।

বুড়া সনাতনের প্রাণটা বড় বেয়াদব। সে রোজই যাইয়া পরেশকে দেখিয়া আসে, এমন কি অনেক সময় তাহার সেবা শুশ্রূষাও করে। হিমাংশুবাবু ব্যাধি সংক্রমণের ভয়ে সনাতনকে বলিলেন "অত মায়া দেখাতে হ'লে হস্‌পিটেলে গিয়েই থাক। আমার ছেলে পুলের ঘর।"

অন্নপূর্ণা কয়েক দিন হয় দেশে গিয়াছেন, তাই এসব খবর রাখেন না।

পরেশ অনেটা ভাল হইয়াছে, আজ সনাতনকে অনেক ক্ষণ বসিতে দেখিয়া পরেশ বলিল—"সনাকাকা, অনেক্ষণ এসেছ এখন যাবে না?" সনাতনের বক্ষ চক্ষুজলে প্লাবিত হইল। পরেশ ত অবাক! ক্রন্দনের কারণ সে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কাঁদছ দাদা?

সনাতন—গিন্নি মা, আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখে ও অভিমানে পরেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

সনাতন—যাব, তুমি একটু ভাল হইলেই আমি যাব।

পরেশ—তবে আর কোথায় যাবে?

সনাতন—যেখানে দুই চক্ষু যায়! ভিক্ষা করে খাব।

পাশের ঘরে নবীন ডাক্তার দাঁড়াইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। নিকটে আসিয়া বলিল—"এখনও কি লোকে ভিক্ষা দেয়?"

সনাতন—গৃহস্থ লোক দেয় না ত কি?

পরেশ—ডাক্তার বাবু, এখনও দিন রাত্রি দুটাই আছে।

নবীন—উজ্জ্বল আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হইয়া পড়িয়াছে; এই বৃদ্ধের ন্যায় পেচকের আর এখানে স্থান নাই।

পরেশ—মা আনন্দময়ীর লীলা বৃক্ষ পত্রের এক পাশে আলো অপর পাশে অন্ধকার চিরদিনই থাকবে।

ডাক্তারের অনুমতি লইয়া পরেশ সনাতনকে হসপিটালেই রাখিল।

নবীন ডাক্তার বয়সে নবীন; পরেশের সমবয়সী ও স্বজাতীয়। হাশপাতালেই উভয়ের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পরেশ হাশপাতাল হইতে বাহির হইয়া দুই সপ্তাহ নবীনের বাসায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। নবীনের সহোদরা হেমলতার যত্নে ও তাহার মাতা ও ভ্রাতৃ বধুর স্নেহে পরেশ বড় সুখে এই কয়দিন অতিবাহিত করিল। যৌবনোন্মুখী হেমলতার অপরূপ রূপ লাবণ্য পরেশের হৃদয়ে একটা বেশ ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

(৪)

শ্যামা পূজার আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকি। অন্নপূর্ণা দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। এতকাল পর মা আনন্দময়ীর চরণ দর্শনে বঞ্চিতা হইবেন ভাবিয়া তাঁর স্বামী-শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন আনন্দময়ীকে ডাকিয়া ডাকিয়া উপবাসিনী অন্নপূর্ণা অবসন্ন দেহে তন্দ্রাভিভূতা, হইয়াছেন; এমন সময় গুরুদেব আসিয়া ডাকিলেন।

(৬)

কার্ত্তিকমাস, দেশের জল নিতান্ত খারাপ। চারিদিকে নানা রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সময় বঙ্গদেশের পল্লি-সমূহের প্রায় সর্ব্বত্রই এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বারমাস কলের জল খাইয়া বিমলের পরিবারবর্গের এই জল সহ্য হইল না। বাড়ীতে কলেরা দেখা দিল। প্রথমেই বিমল বাবু আক্রান্ত হইয়া শয্যা লইলেন। হিমাংশুবালা সহরে যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি করিয়াও কোন ফল করিতে পারিলেন না। হেমলতার পত্র পাইয়া নবীন দা ঔষধের বাক্স সহ বিমলের বাড়ী আসিলেন। আজ হিমাংশুবালার আহ্বানে তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আসিল সহরে প্রতিবেশী পুত্র ফটিক ওরফে প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে দেখিয়া বিমলের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। বিজলী প্রাণ খুলিয়া প্রফুল্লকে অভ্যর্থনা করিল।

দুই দিন না যাইতেই বালক অমলের দাস্ত আরম্ভ হইল, শুনিয়া বিমলের অবসন্ন প্রাণ আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা অহর্নিশি মা আনন্দময়ীকে ডাকিতেছেন, আর রাজ্যের যতকিছু মানস করিতেছেন। হেমলতার আহার নিদ্রা নাই—ঘর করার কাজ ত আছেই, তার উপর রোগীর শুশ্রূষায় তার ক্লান্ত বোধ নাই।

আজ বিমলের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর আসিয়া কাছে বসিলেন। নানা কথায় অবসন্ন বিমলকে উৎসাহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। নবীন ব্রাহ্মণের উত্তর সাধকতা করিতেছে এমন সময় সনাতন আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ডাক্তার বাবু, সর্ব্বনাশ হইল, রক্ষা করুন। ফটিক বাবু দিদিমণিকে নদীর ঘাটে নৌকায় তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে। বিমল বালিসে মুখ গুজিলেন,—ডাক্তার এক লাফে ঘরের বাহির হইয়া খালের দিকে ধাবিত হইলেন। সঙ্গে সনাতন তাহার অনুসরণ করিল। অন্ধকারে অতি কষ্টে নৌকার অনুসন্ধান হইল। নৌকা ধরা পড়িল। ফটিককে পাওয়া গেল না। বিজলীকে নিয়া সকলে ঘরে ফিরিল। তারপর তিন দিন কাটিয়াছে, রোগীদ্বয়ের অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু বিজলীরও ভেদ বমন আরম্ভ হইল। এবার হিমাংশুবালার চৈতন্য সঞ্চার হইয়াছে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া বলিল—"কি উপায় হবে মা? আমার পাপে যে সর্ব্বনাশ হলো!"

অন্নপূর্ণা—"বাছা, কাঁদিয়া কি হবে? আনন্দময়ীকে ডাক কিন্তু শেষ রাত্রিতে বিজলী সকলকে কাঁদাইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। মাতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন, অন্নপূর্ণার চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী অস্থির হইয়া উঠিল। হেমলতা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে খোকা ও ভাসুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কাঁদিল না কেবল ব্রহ্মানন্দ আর বিমল।

আজ দীপান্বিতা। শ্যামা পূজার আয়োজন হইয়াছে। রোগী দ্বয়ের অবস্থা অনেক ভাল। বড় ডাক্তার আর ভয় নাই জানাইয়া ভিজিট ও পাথেয় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। শাশুড়ী বড় বধু সমস্ত দিন পূজার মণ্ডপে পড়িয়া রহিয়াছেন। হেমলতা সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়াও পূজার আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়াছে। পূজায় বসিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "সত্যই মা, তোর দশ হাত আছে।" নবীনের নিষেধ সত্ত্বেও বিমলকে মণ্ডপের বারেন্দায় বিছানা করিয়া দিতে হইয়াছে।

পূজা শেষ হইল গুরু বলিলেন "বলি দাও।" সকলে জোড় হস্তে মাকে ডাকিতে লাগিল। নবীন তীক্ষ্ণধার খড়্গে ছাগ মুণ্ড ছেদন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনগণ কালী প্রীতে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। এমন সময় সনাতন পরেশ পরেশ বলিয়া চিৎকার করিল। সকলে দেখিল পরেশ আসিয়া মণ্ডপের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। হেমলতা একবার পরেশের পানে তাকাইয়া পরক্ষণেই প্রতিমার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। তাহার অপাঙ্গ বাহিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পরেশ বলিল "পাষাণি, সামান্য অপরাধে তুই এত বড় একটা বলি না নিয়ে ক্ষান্ত হলি না। বিজুকে ছেড়ে না হয় আমায় গ্রহণ কর্‌তি। বিমল অতি কষ্টে শয্যার উপর বসিয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আয় ভাই, আমায় কোল দে। মা উচিত বিচার করেছেন।"

ব্রহ্মানন্দ ঠিক পরেশ মা উচিত বিচার করেছেন। করুণাময়ীর কত করুণা! বিজলীকে গ্রহণ করে তিনি সর্ব্বাংশে তোমাদের মঙ্গল করেছেন।"

পরেশ—তবে তাই হউক। সর্ব্বমঙ্গলা মা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পরেশ যাইয়া বিমল প্রভৃতির পদধূলি গ্রহণ করিল। ব্রহ্মানন্দ যজ্ঞ সমাপনান্তে সকলকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। নবীন প্রসাদ বাটিয়া দিল। যুদ্ধে বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়া পরেশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা ও আদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার ফলেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিল। হেমলতা বলিল "মার করুণা সবার চেয়ে আমার উপরেই বেশী।" পরেশ হেমলতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিল—"তাত হবেই তুমি যে তাঁর পূজার যোগাড় দিয়াছ।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

আমরা প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের অজস্র প্রাচুর্য্যে, সহস্রবিধ আয়োজনে, চিত্তের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে নিবিড়রূপে ঠাসিয়া রাখিয়াছি—কোনখানে লেশমাত্রও অবকাশ যাহাতে না থাকে, সে দিকে প্রয়াসের অন্ত নাই—এবং এই অচল ভাণ্ডার যাহাতে চিরদিনের মত অক্ষয় হইয়া থাকে, সেজন্য সমস্ত অনাগত বিপদ্ হইতে ইহাকে বক্ষের ধনের মত করিয়াই রক্ষা করিতেছি—যদি কখনো বাহিরে কোনো ঝড় বাদলের প্রবলতম সংঘাতে এই প্রচুরতম পুঞ্জীভূত স্তূপ, অকস্মাৎ ঘোর ধ্বংস-লীলায় শতদীর্ণ হইয়া যায়, সেই ভাবনায় জীবনকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছি।

আবার অপর দিকে লোভের অন্তহীন তাড়না দ্বিগুণ হইতেও দ্বিগুণতর হইয়া উঠিতেছে—তাই প্রয়াসের পর প্রয়াসের অবিরত উত্তেজনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ খতাইয়া দেখিবারও অবসর নাই—উপকরণ ভূরি পরিমাণে জমিতেছেই—কমিবার দিকে নজর দিতে গেলেও বিপদ্—তাই তিলতম অংশেরও হানি হইলে হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ হাহাকার আরো অত্যুগ্র হইয়া উঠে এবং সে জন্য বিধাতাকে ও স্বীয় অদৃষ্টকে কি বলিয়া দোষ দিব ও ধিক্কার দিব, তাঁর ভাষা খুঁজিয়া বাহির করাও দুষ্কর!

যেন ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়াই এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, কোনো ক্ষুদ্র বস্তুরও লোভ ত্যাগ করা যেন আমাদের প্রকৃতিতে লেখে না—তাই চাওয়ার পর চাওয়ার আর বিরাম নাই—প্রার্থনার পর প্রার্থনা। "চাই চাই" এর সুতীব্র চীৎকারে গগনের সমস্ত রন্ধ্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ধরণীর বক্ষ দারুণতম বেদনার ভরে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সমস্ত বিশ্বের সমস্ত নির্ব্বিকার উদার শান্তিকে অভিহত করিয়া—চারিদিককার—ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত প্রবৃত্তি একেশ্বর হইয়া উঠিল। জগতের সমস্ত অহৈতুক আনন্দকে খর্ব্ব করিয়া মানুষের প্রয়োজন মানুষের স্বার্থ স্পর্দ্ধিত ধৃষ্টের মত আপনার সমুদ্ধত জয়স্তম্ভটীকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিল! মানুষের এই উদ্দাম কামনার সরোষ আস্ফালন, এই উদগ্র বাসনাবেগের ব্যগ্র হা হুতাসের সাম্নে ত্যাগীর সরল-শুভ্র সন্তোষ, সংযমীর ঋজুমুক্ত জীবনের দিব্যদ্যুতি পরিম্লান হইয়া গেল, প্রবৃত্তির জয়ঢাকটার উৎকট শব্দে ত্রিজগত কম্পান্বিত হইয়া উঠিল, তার কাছে বৈরাগীর উদাত্তগম্ভীর একতারাটী এতই ক্ষীণ হইয়াগেছে যে তাহার শান্ত সকরুণ মূর্চ্ছনাটী আর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিতেছে না। কেবল একটী মাত্র সুর মানুষের মর্ম্মকে পীড়িত-মথিত করিয়া সঘন ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত করিতেছে—"চাই—চাই—চাই"!

মানুষের দুর্দ্দাম আকাঙ্ক্ষার এই অপরিমিত ঔদ্ধত্যের সাম্নে ভারতবর্ষের ঋষি একদিন অপরাহত প্রতিভার বলে, নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততো সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া ওঠে, অধর্ম্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্ম্মের দ্বারা সে আপন শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে গোড়া হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি ছত্র রক্ত নিষিক্ত অক্ষরে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পাপীর পরাক্রম যেদিন বিশ্ব পরমেশ্বরের সিংহাসন পার্শ্বে আপন গর্ব্বিত প্রতাপ জাহির করিয়াছে—সেদিনই বিধাতার অমোঘ শাসন বজ্রের আঘাতে তার দৃপ্ত মস্তক ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত করিয়াছে।

তাই ত যুগে যুগে কত রাজ্য মহারাজ্য তৃণের মত ফুৎকার মাত্রে উড়িয়া গেল—কত দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার কালের নিষ্ঠুর প্রলয়াভিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। একদিন যাহারা সুখের সু-উচ্চ অচলে ধরাকে সরা বলিয়া জানিয়াছিল—তাহারা দুঃখের ক্ষুরধারনিশিত খরকণ্টকাপূর্ণ পথে আপনার সমস্ত পরমস্পর্দ্ধিত স্বাতন্ত্র্যকে উৎসৃষ্ট করিয়া দিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে তাহাদের পাপ লীলা পরিসমাপ্ত করিল।

শক্তি যেদিন অলীক দম্ভের দুর্দ্দণ্ড আবেগে শান্তির যোগাশনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে সেদিন সে কিছুতেই

পিতৃ-ভক্তি।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই দুর্দ্দান্ত জর্ম্মণসেনা নান্সি আক্রমণ করিল। হটাৎ এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে নগরবাসীগণের আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। নান্সির বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা যুবকের ন্যায় পূর্ণ উদ্দম লইয়া মাতৃ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরবাসী দিগকে প্রাণস্পর্শি ভাষায় স্বদেশের গৌরব কথা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে দণ্ডায়মান থাকিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নাগরীকগণও বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তার জীবন্ত ও জলন্ত উৎসাহ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া শত্রুর গোলার সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পারিশে সংবাদ গিয়াছে, ইতিমধ্যে তথা হইতে সৈন্য-সাহায্য আসিয়া পঁহুছিলে তাহারাও পূর্ণ উদ্দমে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে; নতুবা অপ্রস্তুত অবরুদ্ধ নগরবাসীগণের পক্ষে এরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখে মৃত্যু ব্যতীত অন্য উপায় আর কি থাকিতে পারে?

* * *

কুমারী টেলিসিয়া বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তার একমাত্র কন্যা। এই মাতৃ হারা কন্যাটীর আকর্ষণে বৃদ্ধ সংসারের মায়া-পাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই; টেলিসিয়াও পিতার এমন 'বাধ্য' হইয়া পড়িয়াছিল যে পিতা ছাড়া এ বিশ্ব সংসারে সে আর কিছু বুঝিত না; ক্রমে তাহার বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিলেও সে তাহার পিতার স্নেহ বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইয়া গিয়া পৃথক সংসার পত্তনের চিন্তা করিতে পারে নাই, পিতার সেবায় নিজের দেহ মন সমর্পণ করিয়া রহিয়াছে।

বিপদ অকস্মাৎ গৃহদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া টেলিসিয়া পিতার সহিত যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইল এবং পিতার সুরে সুর মিলাইয়া নগরবাসীদিগকে প্রদীপ্ত-কণ্ঠে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বৃদ্ধ পিতা ও যুবতী পুত্রীর মুখে জন্মভূমির গৌরব গাথা শ্রবণ করিয়া নান্সির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আরো অধিকতর উৎসাহে মাতিয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের অবরুদ্ধ অবস্থার যাবতীয় দারুণ দুঃখ কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া তাহাদের ভীষণ পরিণামের জন্য সানন্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

* * *

জর্ম্মণ সেনাপতি অনবরত চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য নগর বিধ্বস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার সমস্ত ক্রোধ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নান্সির শাসন কর্ত্তার জন্য পুঞ্জিভূত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে সেই হতভাগ্য শাসন কর্ত্তাকে শূলে চড়াইয়া তাহার ঘোর অবিমৃষ্যকারিতার ফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

* * *

উপর্য্যুপরি গোলার আঘাতে একদিন নগরপ্রাচীর উড়িয়া গেল। বাঁধমুক্ত জলস্রোতের ন্যায় শত্রু সৈন্য নগর প্লাবিত করিয়া ফেলিল। নান্সি অধিকৃত হইল।

নান্সির শাসন কর্ত্তা কোথায়? সেনাপতির পুঞ্জিভূত ক্রোধ সেই বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া গেল; কেহই তাঁহার খোঁজ বলিয়া দিল না।

সেনাপতি নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া আনিয়া বলিলেন—"কে নান্সির শাসন কর্ত্তা, তোমরা আমাকে বলিয়া দাও। আমি তাহাকেই চাই, তোমাদিগকে আমি মুক্ত করিয়া দিতেছি।"

বৃদ্ধ শাসন কর্ত্তা ও তাঁহার বীর দুহিতা সেই শৃঙ্খলিত জনগণের সহিত তথায়ই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিল না।

জনমণ্ডলী নীরব। সেনাপতি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আদেশ করিলেন—"নগরবাসীদিগকে সমানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান কর এবং সেই শ্রেণীবদ্ধ নর-নারীর প্রতি দশম ব্যক্তিকে শূলে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে দাও।"

সেনাপতির আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করা হইল। পুনরায় সেনাপতির পূর্ব্ব আদেশ সকলকে শুনাইয়া দেওয়া হইল—"কোথায় শাসন কর্ত্তা বলিয়া দাও—তোমাদিগকে এখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইবে।"

তথাপি কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না।

* * *

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

মগধ অতি প্রাচীন রাজ্য। মহাভারতের সময় এইখানে জরাসন্ধ রাজত্ব করিতেন। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি যোগদান করিতে অস্বীকার করাতে ভীমসেন ইঁহাকে মল্লযুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজগৃহ বা রাজগির বা গিরিব্রজ মগধের রাজধানী ছিল। তাহার পর আমরা মগধাধিপতি শিশুনাগের নাম শুনিতে পাই। এই বংশের পঞ্চম নরপতি বিম্বিসার বা শ্রেণিক এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময় অঙ্গ রাজ্য (আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের) মগধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইঁহার অজাতশত্রু নামক এক পুত্র ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় শাক্য মুনি মগধে নবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি এই মহাপাপের কথা শুনিয়া অজাতশত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করেন। গঙ্গার উত্তর দিকে ঐ সময় লিচ্ছবি নামক এক অতি পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। ইহারা সুযোগ পাইলেই নদী পার হইয়া মগধে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিত। অজাতশত্রু ইহা নিবারণের জন্য গঙ্গার তীরে এক দুর্গ বেষ্টিত নগর স্থাপন করেন। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে কোশল নামে এক রাজ্য ছিল। অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের মাতুল ইহার অধিপতি ছিলেন। এক সময় সমগ্র অযোধ্যা এবং গঙ্গা গণ্ডক ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থান কোশল রাজ্যের অধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে এই বিপুল রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

উপর্য্যুক্ত শিশু নাগের বংশে মহানন্দীন নামে এক জন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ঔরসে ও এক শূদ্রার গর্ভে মহাপদ্ম নন্দ জন্মিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই মহাপদ্মের মৃত্যুর পর তাঁহার আটজন পুত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের কথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি মগধ হইতে বিতাড়িত হইবার পর পঞ্জাবে যাইয়া আলেকসন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গ্রীকবীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। আলেকসন্দরের পরিত্যক্ত গ্রীক সৈন্য সকল তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া কিয়দংশ স্বদেশাভিমুখে চলিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ এইস্থানে থাকিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়া যায়। ইহার পর চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য আক্রমন করেন এবং নন্দদিগকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। কথিত আছে, এই ব্যাপারে চাণক্য (কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে বিশেষ সাহায্য দান করেন। নন্দ ভূপতিরা এই ব্রাহ্মণকে কোনও সময় অপমানিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নি জনৈক নীচ জাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বংশ ইতিহাসে 'মৌর্য্য' বংশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ঐ সময় ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী আর কোনও নরপতি ছিলেন না। তাঁহার অধীনে ৩০,০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ হস্তী সৈন্য, ২০০০ রথ এবং ৬০০০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। ইঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ দিকে নর্ম্মদা, উত্তর দিকে হিমালয় এবং পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আলেকসন্দরের মৃত্যুর পর এসিয়া খণ্ডের সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার দুইজন সেনাপতির—এণ্টিগোনশ এবং সেলিউকস্ নিকাটর—মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রথমে বিজয় লক্ষ্মী এণ্টিগোনশের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩১২) সেলিউকস নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম এসিয়ার অধিকাংশ স্থান অধিকার করেন। পাঠক জানেন, আলেকসন্দর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়েন। সেলিউকস্ তাঁহার নিকট

জনৈক দূত পাঠাইয়া সিন্ধু নদের পশ্চিম কূলস্থ সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার এই অনুরোধে কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না। সেলিউকস আলেকসন্দরের অতি প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের এই ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন এবং এক বিশাল সৈন্যদল লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েন। সিন্ধুর পূর্ব্ব তীরের কোনও এক স্থানে হিন্দু সৈন্য গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। কয়েক ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধের পর সেলিউকস সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়েন। পরাজিত সৈন্যের সহিত প্রাচীন হিন্দুজাতি কোনও দিন শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে সে দিন সিন্ধু তীর হইতে বোধ হয় এক জন গ্রীকও স্বদেশে ফিরিয়া যাইত না। তাহার পর উভয় পক্ষ সন্ধি করিলেন। ইহার সর্ত্তানুসারে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান প্রদেশ লাভ করিলেন এবং সেলিউকসের এক কন্যাকে তিনি পত্নী-ভাবে গ্রহণ করিলেন। শ্বশুরের সম্মানার্থ মগধরাজ ৫০০ সুশিক্ষিত হস্তী তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

আলেকসন্দরের দিগ্বিজয় কাহিনী গ্রীক ইতিহাস লেখকেরা অতি বিষদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেলিউকসের কাহিনী বিবৃত করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। এই গ্রীক সেনাপতি যদি বিজয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও এ বিষয়ে এ প্রকার উদাসীন থাকিতেন না।

সন্ধি হইবার পর সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করেন। ইতিহাসে ইনি মিগাস্থিনিস্ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েক বৎসর মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করিয়া মগধ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার এই ইতিহাস হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সাম্রাজ্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন :—

পাটলিপুত্র—এই মহা নগরী গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ইহা নয় মাইল ও প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। ইহার চারিদিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। সমগ্র নগরের মধ্যে ৬৪টা ফটক; ঐ প্রাচীরের মধ্যে ৫৭০টি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমস্ত সহর অতি গভীর খাত দ্বারা সুরক্ষিত।

মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত যখন বাহিরে আসিতেন, তখন স্বর্ণনির্ম্মিত ও মণিযুক্তা খচিত শিবিকা ব্যবহৃত হইত। তাঁহার পরিচ্ছদ এমন সুন্দর ছিল যে, মেগাস্থিনিস্ তাঁহা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যখন মহারাজ স্বীয় সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন প্রায়ই হস্তী ব্যবহার করা হইত। সামান্য দূর যাইতে হইলে কখন কখন অশ্বে আরোহণ করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ষণ্ড প্রভৃতির যুদ্ধ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন। কখন কখন এই সকল জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ হইত। এবং ইহাতে জয়লাভ করিলে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইত। অনেক সময় ১২ ০০০ হস্ত পরিমিত ভূমি গোলাকারে ঘেরা হইত। ইহার মধ্যে বড় বড় বলদের গাড়ীতে ঘোড়া এবং বলদ জুতিয়া ছাড়া হইত। সাধারণতঃ মধ্যে একটা ঘোড়া এবং দুই দিকে দুইটা বলদ জোতা হইত। এই দৌড়ে (race) যে শকট প্রথম হইত তাহার অধিকারীকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্ত মধ্যে মধ্যে শীকারে বাহির হইতেন। ঐ সময়ে মহারাজ হস্তীর উপর এবং তাহার চারিদিকে সশস্ত্র রমণী সকল অশ্বের উপর গমন করিতেন। এই সকল রমণী পারশ্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইত। যে পথে মহারাজ যাইতেন উহার উভয় পার্শ্ব রজ্জুদ্বারা রক্ষিত হইত। উহার মধ্যে জন সাধারণ যাইতে পারিত না।

প্রাসাদের ভিতর সমস্ত স্থান উপযুক্ত রমণীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত। তাঁহারা উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মহারাজ সপ্তাহে একদিন প্রকাণ্ড দরবারে বসিয়া সাধারণের আবেদন প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত শীকার, যুদ্ধ কার্য্য বা পার্ব্বন উপলক্ষে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন।

নগেন—থাকিবে কেন? আপনার মুখে সে নামটী লইতেই হইবে।

বিধু বলিল—বিশ্বেশ্বরের নাম লইতে আপত্তি নেই কিন্তু ইহাতে পৌত্তলিকতাকে সম্মান করা হয়, তারপর একটা—বিধু মুখ বিকৃত করিল।

নগেন জোরে হাসিতে পারিল না; নতুবা সে হাসিয়া সকল ঘর কাঁপাইয়া তুলিত।

মৃদু হাস্য করিয়া নগেন বলিল—"দুর্গাদাস বাবু সপরিবারে কিন্তু এই * * * দেবতাটীর মাথায় বিল্বপত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।"

বিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বলেন কি! অবাক্ করেন যে?"

নগেন বলিল "এগুলি কিন্তু' আপনাদের ভারি কু-সংস্কার!"

এই অবসরে দুঃখিনী স্নানে চলিয়া গিয়াছিল। বিধু অবসর বুঝিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। বিধু বলিল—

"দেখুন নগেনবাবু, ও দুঃখিনীকে কিন্তু আর ছেড়ে যাওয়া হবে না, ওকে আমাদের orphangeএ রাখ্‌ব, জীবনটা ওর সৎপথে যাবিত হবে। আমি ওকে দুদিন পতিতা জীবনের পরিণাম বিষয়ে বলেছি—ওর রিপেণ্টেন্স হয়েছে। কেঁদেচে—"

নগেন—"ওর সম্বন্ধে কি আপনি কিছু জানিয়াছেন নাকি?"

বিধু—"কিছুই না। বেনারেসের মেয়ে—ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে হয় না, ওসবকে ঘৃণাও কত্তে নেই—পাপকেই ঘৃণা।

নগেন বলিল—"তার এখনও তেমন বয়স হয় নাই। আপনি সেরূপ কোন কথা বলিবেন না, তাতে ওর দুঃখ হয়। ওর সম্বন্ধে যা হয়, ব্রহ্মগারীই করিবেন।"

বিধুর নিকট ব্রহ্মগারীর ব্যাপারটা ভাল লাগিল না। সে বলিল—'ব্রহ্মচারী ওর কি করবেন? ও Beneres থাকলেই নষ্ট হবে, বলে দিচ্ছি; ওকে নিয়ে যেতে হবে। নেহাৎ যদি কেউ সমাজে নাই নিতে চায়, আমিই বরং তার ভার গ্রহণ কত্তে রাজি হব। মেয়েটি জানেন কি—খাটে বেশী, খায় কম; ভাবে বেশী, কথা বলে কম, এরূপ লোক সহজে পোষা যায়।

নগেন হাসিয়া বলিল—বকুলের কি মত হইবে?"

বিধু দুঃখিত হইয়া বলিল—"সেওতো আপনি—নগেন বাবু উড়িয়ে দিলেন। এই না চিঠি, গত বুধবারে বোম্বে Mailএ যতীন বোস্ America চলে গেল; আপনি একটু বল্লেই হতো?" বলিয়া বিধু তাহার পকেট হইতে এক গাদা চিঠি বাহির করিলেন।

নগেন বলিল "এ শৈলেনের চিঠি না?"

বিধু—"হুঁ, শৈলেন লিখেছেন, তিনি চেষ্টা করেও বিদেয় পেলেন না। যাই হক অক্টোবরে আপনার সঙ্গে গিড়িডিতে দেখা করবেন।"

নগেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"অক্টোবরে গিড়িডিতে! সে কেমন?"

বিধু—ওকে যে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হস্পিটেলে ছমাসের জন্য ৫০৲ টাকায় সাব এসিষ্টাণ্টের কাজে নিযুক্ত করেচে।

নগেন—"গিড়িডিতে কেন?"

বিধু—দুর্গাদাস বাবুর পরিবার অক্টোবরে তাঁদের গিড়িডির বাড়ীতে changeএ আসচেন; আপনার শরীর একটু সেরে উঠলেই আপনাকে গিড়িডিতে নিয়ে যেতে দুর্গাদাস বাবু লিখেছেন।

নগেন—"ওদব কোন খবরইতো আপনি আমাকে দেন না?"

বিধু—"এত দিন ব্রহ্মচারীর নিষেধ ছেল—কোন কাগজ পত্র বা চিঠি পত্র দিতে বা জানাতে।"

নগেন—"ও কাগজগুলি কি?"

বিধু উৎসাহের সহিত বলিল—"ভারি হোপফুল নিউস্—আশার কথা! শুনুন"—বলিয়া বিধু একখানা ছাপার কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল—

অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা—

নগেন বলিল—"রক্ষা করুন—মুখে বলিয়া ফেলুন, এত শুনিবার ধৈর্য্য আমার নাই।"

বিধু—"সেই জন্যইতো চিঠিপত্র দিতে নিষেধ ছেলো, মোট কথা—দুর্গাদাস বাবু মিকাসিকস্ শিখ্‌তে যতীন বোসকে আমেরিকা পাঠিয়েছেন; এদিকে বেঙ্গল কটন-মিলস ম্যাপনের এই হেণ্ডবিলস্ দিয়ে ১০ টাকা করে ৫০

হাজার টাকার সেয়ার চাচ্ছেন। Miniature formএ আপাতত একলক্ষ টাকা কেপিটাল নিয়েই সুতোর কল আরম্ভ হবে। বাকী ৫০ হাজারের share তিনি নিজে নিচ্ছেন। ওদিকে সুসঙ্গ পাহাড়ে ও বিল টিপারায় প্রচুর জমি নিয়েছেন, ওতে তুলো হবে—A grand aggrandisement. এখন দয়াল প্রভুর ইচ্ছে। টাকার অভাব হবে না। এ কদিনেই এখানে আমি ২০ হাজার টাকার share বিক্রয় কল্লুম। ডাঃ ব্যাকৃচি ১০৲ হাজারের share একাই নেবেন।" বলিয়া বিধু বাবু উৎসাহের হাসি হাসিলেন।"

নগেন হাসিয়া বলিল—"শুভসংবাদ বটে! এখন দেখুন, যদি তুলার চাষে রাজি হন, না হয় আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। যতীন বোস তো আর হুজনকেই নিবেন না। আর একটা চেয়ার তো ভেকেণ্টই রইল!"

বিধু বলিলেন—"আপনার শুভ চেষ্টা, আর আমার অদৃষ্ট।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণের চেষ্টায় পীরপুরের অনেক বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় নাই।

একটা শ্রাদ্ধ ও একটা বিবাহ তিনি—উভয় সমাজকে বাদ দিয়া—এমন ভাবে স্থাং স্থিং করিয়া করাইয়াছেন যে দরিদ্র কর্ম্মকর্ত্তাদের একটী পয়সাও ধার করিতে হয় নাই। অবশ্য লোক নিন্দাকে এই সব ব্যাপারে বরণ করিয়া না লইতে পারিলে হয় না—তাহা কর্ম্মকর্ত্তারা ঋণগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে করিয়াছেন। উপায় নাই।

নমশূদ্র সমাজে একটা বিধবা বিবাহ হইয়াছিল। তাহা লইয়া গ্রামে ও নমশূদ্র সমাজে দলাদলির শোচনা হইয়াছিল—শাস্ত্রী মহকুমা মাজিষ্ট্রেটকে ও জমিদারের নায়েবকে উপস্থিত রাখিয়া সেই বিধবার হাতে নমশূদ্র সমাজের সকলকেই অন্ন গ্রহণ করাইয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

পীরপুর স্কুলের বালকেরা সেবক সমিতির সভ্য হইয়া প্রতি গৃহ হইতে রোজ মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে; তাহাতেও মাসে ২৫৲ ৩০৲ টাকা আদায় হইতেছে।

যুদ্ধে পাটের বিক্রি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দরিদ্র কৃষক দিগকে ঐ অর্থ হইতে ঋণ দান করিয়া সাহায্য করা হইতেছে। এইরূপ নানা উপায়ে শাস্ত্রী-বিদ্যাভূষণ গ্রামের দরিদ্রদিগের সাহায্য করিয়া আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পাটের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠায় জয়নগরের খাজানা বন্ধ হইয়াছে; খামারের আগু ধান্যও প্রজারা খাইয়া ফেলিয়াছে. সুতরাং তারাচরণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, হাত পাতিবারও ঠাঁই নাই। উপায় হীন হইয়া তিনি গ্রামের মামলা ফুটাইয়া টর্নির কার্য্য করিতেছেন।

শৈলেন কলিকাতা পঁহুছিয়াই তারাচরণকে একখানা কার্ডলিখিয়া জানাইয়াছিল যে—তাঁহার দুর্ব্বাক্য বজ্রের ন্যায় তাঁহার পুত্রের বক্ষে আঘাত করিয়াছে—এবং সে সেই দিন হইতে প্লেগে শয্যাশায়ি হইয়াছে।"

চিঠিপাইয়া প্রথমে তারাচরণের রাগ হইয়াছিল, পরে তিনি চিন্তিত হইলেন। চিন্তা ব্যতীত কোন প্রতিকারের তাঁহার তখন ক্ষমতা ছিল না; কাশীতে যাইবার অর্থতো তাঁর নিকট ছিলই না। ছেলের বিপদ জানাইয়া কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গেলেও—বাড়ীর আর উপায় ছিল না। অভাবে পড়িয়া স্ত্রীর গহনা গুলি পর্য্যন্ত তিনি বন্ধক রাখিয়া সংসার চালাইয়াছেন—এখন নিরুপায় সুতরাং ছেলের শুভ কামনা ব্যতীত তাঁহার অন্য করণীয় আর কি হইতে পারে?

তারাচরণ শৈলেনের নিকট হইতে কাশীর ঠিকানা জানাইয়া নগেনের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন—প্রায় পনর দিন পরে—বিধুভূষণ শর্ম্মার স্বাক্ষর করা এক চিঠিতে তিনি নগেনের বিস্তৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর চিঠিপত্রাই পুত্রের সংবাদ জানিতেছেন; ইহার বেশী তাঁহার করিবার ক্ষমতা ছিল না—করিতেও তিনি কিছু পারেন নাই।

পূজার পূর্ব্বে তারাচরণ বিপদে পড়িয়া গেলেন। ছেলেদের স্কুলের বেতন চলিতেছে না—না হয় কিছু দিন স্কুল বাধা হইবে। ছেলে মেয়েদের কাপড় নাই—না হয় ঘরের বাহির না হইবে। কিন্তু ঘরে যে একটী পয়সা

যুদ্ধের প্রাবল্যে যখন ইয়ুরোপীয় বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল তখন দুর্গাদাস বাবুর এবং আরও কতিপয় জন নায়কের অর্থে ও উদ্যোগে কলিকাতায় একটা সওদাগরী ব্যবসায়ের সূচনা হইয়াছিল। ক্রমে দুই তিন মাসের মধ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ মনে হইতে লাগিল।

দুর্গাদাস বাবু নগেনকে সেই স্বদেশী সওদাগরী আফিসে একশত টাকা বেতনের একজন এসিষ্টাণ্ট করিয়া দিলেন। আর বিধুবাবুকে আগরতলা তুলার চাষের বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

চাকুরী লইয়া নগেন নূতন বাড়ী ভাড়া করিল। কিন্তু দুর্গাদাস বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ইতো-মধ্যে বদ্রিনারায়ণ হইতে বাবা যোগজীবন ব্রহ্মচারীর এক চিঠি পাইয়াছিলেন। সে চিঠিতে দুঃখিনীর সম্বন্ধে ২।১ টা কথা ছিল। সেই চিঠির কথা ও অন্যান্য নানা বিষয় ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"শৈলেন বাড়ী হইতে আসুক, তারও থাকিবার ভাল ব্যবস্থা নাই—দুইজনে এক বাসা করিয়া থাকিও, খরচ কম লাগিবে। টালিগঞ্জে যদি থাক, সে ও মন্দ হইবে না—অনর্থক বাড়ী ভাড়া কেন দিবে?"

নগেন কোন উত্তর করিতে পারিল না; নূতন বাড়ীতেও তাহার যাওয়া হইল না।

প্রকৃতির প্রতি।

(১)

কে তুমি গো দেখ্‌ছো ভুবন চাঁদের চোখে চেয়ে!
সকল প্রাণী আকুল হোলো দিঠির আলো পেয়ে।
সবুজ পাতার রং-মহালে, কোকিল ডেকে মন মাতালে,
শিহরিয়া উঠ্‌লো হিয়া পুলকে গান গেয়ে।

(২)

তরুর কচি কোমল পাতায় রঙের ঝিলিমিলি।
পাখীরা সব কূজন করে—মধুর কিলিকিলি।
হাওয়াতে আজ স্বপনভাসে, শিউলি সুবাস ছুটে আসে,
গন্ধে শেষে অন্ধকোরে মনটি কেড়ে নিলি।

(৩)

জ্যোস্না গুলে কি আঙুলে দিলি আলিম্পন।
ঘর বাড়ী মোর হাসছে পেয়ে হাতের পরশন।
তুমি কাহার প্রেমেরলাগি, দিনযামিনী আছ জাগি',
আজ অবধি শেষ হোলো না পূজার আয়োজন।

(৪)

লক্ষ তারার আলো জ্বলে গগন-চাঁদোয়ায়।
দিগ্‌বধূরা দাঁড়ায় ঘিরে দৃষ্টি-সীমানায়।
তুমি আপন ধ্যানে মগন, প্রাণে পুলক—অশ্রু নয়ন,
কোয়াসার শেত শুভ্রনাথানি অঙ্গেশোভা পায়।

(৫)

পরাণের কাণ সজাগ আজি, শুনাও বন্দনা।
ঝঙ্কারিয়া উঠুক্ হিয়া পেয়ে মূর্চ্ছনা!
গাইছ কি সুর আকুল-করা, ধরি ধরি যায় না ধরা!
কাণটি পেতে বোসে আছি, আরতো অন্ধ না!

(৬)

কবে তোমার গোপন কথায় জাগ্‌বে আমার প্রাণ!
তোমার প্রেমের কণা পেয়ে ভুল্‌বো অভিমান!
কাট্‌বে আমার অমানিশা, থাক্‌বে না আর সুখের তৃষা,
গেয়ে যাবো পুলক-ভরা পাগল-করা গান!

(৭)

পূজার প্রসূন নাইকো আমার, কণ্ঠে নাই সে বাণী।
আঘাত-পাওয়া কান্না-ভরা আছে হৃদয়খানি।
তোমার সাথে পূজ্‌তে তাঁকে, ডাক্‌ছো বটে মধুর ডাকে,
নাও না তবে আপন কোরে হাত দুখানি টানি'।

(৮)

মলিন বোলে সবাই যবে ভাঙ্‌লো আমার মন!
তখন তুমি দেখা দিলে, দিলে আলিঙ্গন!
কেন এখন পথের মাঝে, কাঁদাও নানান্ বাজেকাজে!
পূরাও আমার প্রাণের আশা ভালোবাসার জন!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ভাড়ি পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ; তারপর চাপরাসিকে বলিলেন—"সেলাম জানাও সাহেব কো।"

সাহেবি পোষাকে সজ্জিত আগন্তুক মিষ্টার মিত্রকে দেখিয়া জগদীশ বাবু লজ্জিত হইলেন—সেই কল্যকার তাঁহাদের সঙ্গীয় বেলুড়ের যান্ত্রিক। তিনি এত বড় কাজ করেন।

জগদীশ উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলে ভদ্রলোকটী পরিতোষের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"শিশুটিকে নিরাপদেই পেয়েছিলেন তো ?"

জগদীশ লজ্জার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হাঁ, ভগবানের ইচ্ছেয় নিরাপদেই ছেলো।"

"আমাদের সেই T. A. বিলটা নিয়েই বড় সাহেবের নিকট আসাগেছিল, আপনার খবরটাও নিয়ে গেলুম।" বলিয়া ভদ্রলোকটী মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"ভুলটী কিন্তু বেশ ক্ষুদ্রই ছিল !"

জগদীশ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আর লজ্জা দেবেন না।"

রজক ও রাসভ।

রজক রাসভে কহে—"বোঝা আরো দিব ?
বোঝা বহা তোমাদের জাতের স্বভাব।"
রাসভ কহিল—"প্রভো ! যত দাও নিব,
এ নহে স্বভাব দোষ—স্বাধীনতাভাব।"

শ্রীঃ—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
তারিখ সং

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বিক্রমপুরের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; মূল্য কাপড়ে বাঁধা ৩৲ তিন টাকা।

এই গ্রন্থে বিক্রমপুরের কয়েকটী প্রসিদ্ধ গ্রামের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুর, ইতিহাস-প্রখ্যাত প্রাচীন স্থান। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ইহার পল্লী ভূমির সহিত কত কত মহাত্মার বাল্য জীবনের খেলা ধূলার স্মৃতি বিরাজিত, ইহার পুত রেণু কণার সহিত কত ঐতিহাসিক উপকরণ অলক্ষ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সুপ্রসিদ্ধ পরগণার কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, সাহিত্য, শিল্পকথা, প্রবচন এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনস্বি ব্যক্তি দিগের জীবন কথা আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানা লিখিত হওয়ায় এই গ্রন্থ কেবল যে বিক্রমপুরবাসীরই মনোরঞ্জনের জিনিষ হইয়াছে তাহা নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী প্রকাশিত করিয়াছে সুতরাং ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থ আদরের সামগ্রী হইবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। ইতঃপূর্ব্বে গ্রন্থকার তাহার বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়া যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন সমালোচ্য গ্রন্থখানা তাঁহার সেই পূর্ব্বার্জ্জিত যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলি একটু সংক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থে কয়েকখানা চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাপা পরিষ্কার।

স্বস্তিকা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ছয় আনা।

এই গ্রন্থে কয়েকটী আধ্যাত্মিক কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে ভক্তের প্রাণের ব্যগ্রতা বর্ত্তমান। পাঠকগণ স্বস্তিকাপাঠে স্বস্তি লাভ করিতে পারিবেন।

কলিকাতা Printed by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca

"আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র-নন্দিনী" এই সংক্ষিপ্ত কথা গুলিতে যে পিতৃকুলের গৌরব-বোধ সূচিত হইতেছে, তাহা কি কোন ফুলত্যাগিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে? অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার সম্মিলনকে অবৈধ সম্ভোগ বলিতেছেন। বস্তুতঃ আমাদের মতে, এই কাব্যের মধ্যে আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতির লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, তন্ত্র-মন্ত্র, ঢাক-ঢোল প্রভৃতির সমাবেশ দ্বারা সমগ্র কাব্যের সহজ গতি ও পরিণতির পথে বাধা জন্মাইয়া রসাতিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটাইলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিল্পীর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইত। প্রতিভার লক্ষণই এই—ইহা সর্ব্বথা অনাবশ্যককে বর্জ্জন করিয়া থাকে—কোন্ স্থলে কোন্‌টি এবং কতটুকু প্রয়োজন ও শোভন, এই ওজনের সূক্ষ্ম বোধ সকল প্রতিভাবান্ শিল্পীই প্রকৃতির হাত হইতে পাইয়া থাকেন। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের এই উপসংহারে অতি কৌশলে, প্রসঙ্গ ক্রমে দুএকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার যৌন-সম্মিলন যে বৈধ উপায়ে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া স্থূলদৃষ্টি পাঠকের সকল সংশয় দূর করিয়া দিলেন।

আবার উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে চিত্রাঙ্গদার যে পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের আদর্শ প্রাপ্ত হই, আধুনিক ভারতবর্ষ, আমাদের নারী-জীবনে সেই আদর্শের সফলতার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছে। এই আদর্শের প্রেরণায় বঙ্গ-গৃহের লজ্জাবনতা, লীলাঙ্গিনী ললনাকুল শুধু 'যামিনীর নর্ম্ম-সহচরী' না থাকিয়া 'দিবসের কর্ম্মসহচরী' হইয়া উঠিলে,—প্রেমের সঙ্গে কর্ম্ম, সেবার সঙ্গে সাহচর্য্য, সৌন্দর্য্য ও শীলতার সঙ্গে শৌর্য্য সম্মিলিত করিয়া পূর্ণ নারী-মহিমায় ফুটিয়া উঠিলে,—এক কথায়, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ বীরজায়া ও বীরমাতারূপে স্তন্যের সঙ্গে বীর-শিক্ষার বীজ বঙ্গ-সন্তানের ধমনীতে আশৈশব সঞ্চালিত করিয়া দিলে আমাদের গৃহে গৃহে দ্বিতীয় অর্জ্জুন জন্মলাভ করিবে এবং তখনই আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা দূর হইবে; তখনই কবি বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া যে দারুণ হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"শত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

তাহার উপশম হইবে।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য দুর্নীতিপূর্ণ, পাপের উজ্জ্বল চিত্র নহে,—এই কাব্যে মহাভারতের অর্জ্জুন আপনার পার্থ-গৌরব হইতে চুল পরিমাণেও বিচ্যুত হন নাই। রবীন্দ্র-নাথের অর্জ্জুন একাধারে বীর এবং প্রেমিক—তাহাতে ক্ষাত্র বীরের কাঠিন্যের সঙ্গে প্রেমের কারুণ্য মিশিয়া চরিত্রগত সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। আবার, ব্যাসদেবের কাব্যের উপেক্ষিতা চিত্রাঙ্গদা, সেই অস্পষ্ট রেখারূপিণী চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের তুলিকার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সমস্ত বিশ্বের সৌরভ-শোভায়, আলোকে পুলকে সুগঠিতা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নহে,—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে জগতের চিরন্তন নারী-রহস্য যেন তার সকল বৈচিত্র্য, শোভা ও পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা লইয়া সহস্রদল পদ্মের ন্যায় আপনাআপনি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই কাব্য পাঠে আমরা বুঝিলাম, রূপ-যৌবন ফুল দলের লঘু লাবণ্যের মত ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা নিরর্থক নহে—তাহা দেবতার দান; কারণ যৌবন-সম্পদের বাহ্য উপচারেই প্রেমদেবতার উদ্বোধন,—ভোগের মদিরা হইতেই সর্ব্বত্যাগিনী প্রীতির অমৃত উদ্ভূত হয়—কামের পঙ্ক হইতেই প্রেমের স্বর্ণকমল জন্ম-লাভ করে, যাহা 'কেহ দেয় দেবতা-চরণে, কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।' এক কথায়, যে "অরূপ রতনের" জন্য মানুষ সৃষ্টির আদি হইতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে 'রূপ সাগরে ডুব দিয়াই' সেই অরূপ পরম সুন্দরের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মঙ্গলাকর শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা নীরবতা দ্বারা মানিয়া লইয়া আমরা যে সাহিত্যিক অনৃতের পাপভাগী হইতেছি তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি সাহিত্য-সমাজপতিগণ অগ্রসর হইবেন না?

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর।

হৃদয়রাণী।

('প্যারডি' বা ব্যঙ্গানুকরণ।)

যখন সোণার গগণ ব্যাপিয়া জলদ ভীষণ হাঁকে;
নভরে নভরে ডুবায় আদরে, খালে বিলে ব্যাং ডাকে,
এহেন সময়ে বাহানা কে বলে—"কোথা গেছলেনখানি?"
আমার আদররাণী সে যে গো—আমার হৃদয় রাণী।

দুটি কাটা বোলে হাঁ কোরে যখন বায়সেরা পানি খাচে,
একটু শীতল সমীর পরশে সবে হাঁফিছেড়ে বাঁচে;
তখন হুঁকাতে গলেগো আমার শাণিত শ্রীমুখবাণী—
আমার আদররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

যা কলে আদরে যাঠে বরষাতে চুরুট-চুকিত না যে,
তাহারই বাহানা আগে হৃদয়ে, তাহারই নাসিকা বাজে,
সখী যাঁতারে আছে জুড়ে সেই আমার আদরখানি
আমার আদর রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

তোফলের বেলা হইবে আমার আপন আদর বাসী,
'তোমার হয়েছে' বলিয়া তাহার হেরিব মধুর হাসি,
শুনিব তখন কোকিল কণ্ঠে আবার সোহাগ বাণী
আমার আদররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মেস্‌মেরিজম।

(ইংরেজী গল্প)

যখন মিঃ কপের শিশুসন্তানের দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয় তখন বেচারা রাত্রে অত্যন্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সন্তান বৎসল পিতা পুত্রের জন্য একটু বেশী মাত্রায় যত্ন-শীল হইয়াছিলেন এবং যতখানি মনোযোগ তাহার প্রতি দেওয়া আবশ্যক ছিল তিনি তাহা অপেক্ষা বেশীই দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রে পুত্র যখন পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিয়া উঠিল, মিঃ কপ্ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অর্দ্ধোলঙ্গ বেশে উঠিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন এবং তাহাকে নানা প্রকারে দোলাইয়া, গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; এরূপ ভাবে উঠিয়া শান্ত করিবার পালা যখন পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ বার অতিক্রম করিল তখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাঁহার যে সহ্যকরিবার শক্তি ও সাহসের অভাব নাই একথা ভাবিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত শিশুকে ঘুম পাড়াইতেন।

একদিন রাত্রে শিশুটি কিছু অধিক মাত্রায় অস্থির হইয়া উঠিল, এবং সারারাত অনিদ্রিত থাকিবার জন্য যেন স্থির সঙ্কল্প করিয়া বসিল; মিঃ কপ্ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, একটা দাস্ত হইবার 'পিল্' উহাকে খাওয়াইয়া দিলে ভাল হইত, কারণ নিশ্চয়ই পেটের বেদনায় উহাকে এরূপ অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

প্যারোগেটিভ্ পিল্ কাজেই ছিল, তিনি আনিবার জন্য মিসেস কপ্‌কে নীচে ভোজনাগারে যাইতে হইল।

মিসেস্ কপ্ প্রস্থান করিলে, মিঃ কপের মনে পড়িল, অনেকের বেদনা মেসমেরিজম্ অতি সহজে উপসমিত হয়, এরূপ কথা শোনা গিয়াছে; বস্তুতঃ সম্মোহনের এত প্রবল শক্তি আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার নিজের কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। এই সব চিন্তায় তিনি অন্যমনস্ক হইয়া শিশুর ভ্রূযুগল ঈষৎ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কয়েকবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া গেলেন। তিনি লইয়া মিসেস্ কপ্ যখন সোপানারোহণ করিতেছিলেন তখন মিঃ কপ্ আশ্চর্য্যের সহিত চাহিয়া দেখিলেন শিশুটি সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছে। মিসেস্ কপ্ আসিয়া উহাকে তাহার বিছানায় শয়ন করাইলেন। সে রাত্রিতে আর তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিল না।

পরদিনও দেখা গেল শিশু নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে; কর্ত্রী বলিলেন, হয়তো উহার দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই সে এত আরাম বোধ করিতেছে। মিঃ কপ্ সংক্ষেপে বলিলেন "হইতে পারে"। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটা সন্দেহের ক্ষীণ রেখার উদয় হইয়াছিল।

প্রাতর্ভোজ সমাপন করিয়া মিঃ কপ্ উপরে শয়ন কক্ষে দেখিতে গেলেন, শিশুটি তখন জাগ্রত হইয়াছে কি